সম্পাদকীয়

কুরআনের মান্যকারী শির্‌কমুক্ত পাক পবিত্রতা লাভ করে

"কুরআন করীমের পরিপূর্ণ মান্যকারী যে ব্যক্তি স্বীয় দাসত্বের মর্যাদাকে শনাক্ত করতে পেরেছে ও এতে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই ব্যক্তি হচ্ছে এমন যে-আল্লাহ্ তাআলার বড়ত্ব মহত্ত্ব, মহানুভবতা ও উদারতায় সর্বদা গভীরভাবে নিমগ্ন থেকে নিজের প্রকৃত তাৎপর্য-অবমানিত অনস্তিত্ব, শূন্যতা ও অক্ষমতা জেনে যায়। স্বীয় রিক্ত নি:স্ব ও সহায় সম্বলহীন অবস্থা এবং ভুল-ত্রুটি উপলব্ধি করে নিজেকে অপরাধী ভাবে আর তুচ্ছ সব গুণ যা তাকে প্রদান করা হয়েছে, সেটাকে আকস্মিক ওই সূর্য-কিরণ ও রশ্মির মত মনে করে, যা আচমকা কোন মুহূর্তে সূর্য থেকে দেয়ালে পতিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, এর অর্থাৎ আলোকরশ্মির ওই দেয়ালের সাথে কোনই যোগসূত্র বা সম্পর্ক নেই, এ হলো মেকী সাজ-সজ্জার মত, ব্যর্থ প্রয়াসের অনুরূপ। অতএব, যাবতীয় সদগুণসমূহ খোদাতেই পরিবেষ্টিত হয়ে অবস্থান করে এবং সকল পুণ্যকর্মের উৎস তাঁর পরিপূর্ণ ও পূর্ণ সত্তাতেই বিদ্যমান। অত:পর আল্লাহ্ তাআলার মর্যাদা ও পূর্ণাঙ্গীন পরিপূর্ণ গুণাবলী অর্জনের উদ্দেশ্যে আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতির এ পথ-যাত্রায় তাদের অন্তর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানে **(হাক্কুল ইয়াক্বিনে)** প্রাচুর্যতা লাভ করতে থাকে, উপলব্ধি করে নেয়-আমরা কোন কিছুই নই। এতটা তুচ্ছ যে স্বীয় অস্তিত্ব, নিজস্ব ইচ্ছা বা অভিলাষ পুরোপুরি হারিয়ে ফেলে, আল্লাহ্ তাআলার শ্রেষ্ঠত্বের উত্তাল সমুদ্র তার অন্তর এমনভাবে ছেয়ে নেয় যে হাজারো রকমের অস্তিত্ববান অনস্তিত্বে পতিত হয়ে তাঁর মাঝে বিলীন হয়ে থাকে, এভাবে সে সুপ্ত ও গুপ্ত শির্‌ক এর প্রতিটি রন্ধ্র থেকে সম্পূর্ণরূপে বিধৌত হয়ে পাক-পবিত্র হয়ে যায়"।

(বরাহীনে আহমদীয়া, ৪র্থ খন্ড, ৪৫৩ পৃষ্ঠা)

৩১ জুলাই ২০০৯

সূচীপত্র

বিষয়	*পৃষ্ঠা নং*
● *কুরআন শরীফ*	২
● *হাদীস শরীফ*	৩
● *অমৃত বাণী*	৪
● *জুমুআর খুতবা (১৫ মে ২০০৯) ঃ* *হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)*	৫-১২
● *দুরূদ শরীফের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ঃ* *সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী*	১৩-১৫
● *নেযামে নও* ভাষান্তর ঃ মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্	১৬-২০
● *খিলাফত আধ্যাত্মিক উন্নতির মাধ্যম* এম আহমদ	২১-২২
● *হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)-এর বাংলাদেশ সফর* মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল	২৩-২৫
● *সংবাদ*	২৬-৩২
● *সুস্থ্য থাকতে পাতিলেবু*	৩৪
● *কৃষিপাতা*	৩৪-৩৫
● *দৈনিক পত্র-পত্রিকার পাতা থেকে*	৩৬

প্রচ্ছদ ঃ ইউ.কে. জামা'তের জলসা '০৯ এর একটি দৃশ্য
ডিজাইন ঃ তারেক আহমদ (সবুজ)

নামায-আল্লাহ্ তাআলার সমীপে বান্দার চরম মিনতি

"নামায আদায় পদ্ধতি, এর নিজের মাঝে শিষ্টাচার নম্রতা সকাতর অনুনয় বিনয় ও অক্ষমতার প্রকাশাদি ধারন করে আছে। **কিয়ামকালে** নামাযী হাত গুটিয়ে বা বেঁধে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে যেভাবে এক চাকর তার মনিবের সামনে বা দাস তার বাদশাহ্‌র সামনে বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। **রুকূ** প্রদানের সময় মানুষ অনুনয়-বিনয় প্রকাশ করতে অবনত হয়ে যায়। সর্বাধিক বিনয় প্রকাশ পায় **সেজদারত** অবস্থায়, যা অনুনয়-বিনয় ও কাকুতি-মিনতির চরম অবস্থা প্রকাশ করে।" (মির আতুল হাকায়েক ৪র্থ খন্ড, সংকলিত ফতওয়ায়ে আহমদ, প্রকাশকাল ১৩২৫ হিজরী সন, প্রকাশক মৌ. মোহাম্মদ ফযল সাহেব চেঙ্গুয়ী পৃষ্ঠা ১৫)।

কুরআন শরীফ

সূরা হূদ-১১

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ۚ مَا مِنْ دَابَّةٍ
إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٧﴾

৫৭। নিশ্চয় আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করছি। প্রত্যেক বিচরণশীল প্রাণীর ললাটের কেশগুচ্ছ তাঁরই মুঠোয়[১৩২৫] রয়েছে। নিশ্চয় আমার প্রভু-প্রতিপালককে সরলসুদৃঢ় পথে (পাওয়া) যায়।

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ ۚ
وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا ۚ إِنَّ
رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿٥٨﴾

৫৮। অতএব তোমরা মুখ ফিরিয়ে রাখলে (জেনে রেখো) আমাকে যে (শিক্ষা) দিয়ে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে তা আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। (কিন্তু তোমরা মুখ ফিরিয়ে রাখলে) আমার প্রভু-প্রতিপালক অন্য কোন জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করে দিবেন। আর তোমরা তাঁর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয় আমার প্রভু-প্রতিপালক সবকিছুর সুরক্ষাকারী।'

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ
بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٩﴾

৫৯। আর আমাদের সিদ্ধান্ত যখন এসে গেলো তখন আমরা হূদ ও তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল আমাদের (নিজ) কৃপায় তাদের রক্ষা করলাম এবং আমরা এক কঠোর আযাব থেকে তাদের উদ্ধার করলাম।

وَتِلْكَ عَادٌ ۖ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ
وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٦٠﴾

৬০। এই হল 'আদ' (জাতি)। তারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী অস্বীকার করেছিল, তাঁর রসূলদের অবাধ্যতা করেছিল এবং প্রত্যেক কঠোর স্বৈরাচারী (ও) উদ্ধত ব্যক্তির আদেশের অনুসরণ করেছিল।

وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا
إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۗ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ﴿٦١﴾

৬১। আর ইহকালে এবং কিয়ামত দিবসেও অভিশাপ তাদের পেছনে লাগিয়ে দেয়া হলো। শুন! নিশ্চয় আদ (জাতি) তাদের প্রভু-প্রতিপালককে অস্বীকার করেছিল। সাবধান! 'আদ' (অর্থাৎ) হূদের (জাতির) জন্য ধ্বংস[১৩২৫-ক]।

১৩২৫। এটা আরবদের প্রাচীন প্রথার দিকে ইঙ্গিত করছে; যখন কোন যুদ্ধে পরাজিত ব্যক্তি বা দলকে বিজয়ীর সামনে বন্দী অবস্থায় আনা হত, তখন সেই বন্দীর মাথার অগ্রভাগের কেশগুচ্ছ ধরে বিজয় গৌরব প্রকাশ করা হত, অথবা জয়োল্লাসের চিহ্ন স্বরূপ বন্দীদের মাথার চুল মুণ্ডিয়ে দেয়া হত।

১৩২৫-ক। "বু'দান" দ্বারা দুরত্ব, অভিশাপ বা অমঙ্গল প্রার্থনা বুঝায়। বাউদা হতে বু'দ উৎপন্ন, যার আভিধানিক অর্থ: সে দূরে রইল; নিপাত গেল; অভিশপ্ত হল। যেমন বলা হয়ে থাকে : 'ব'দান লাহু' অর্থাৎ সে অভিশপ্ত হউক; সে নিপাত যাক (লেইন)।

হাদীস শরীফ

আল্লাহ্‌র ভালবাসা ও তাঁর ভয়ে ক্রন্দন কর

ওয়া ইয়াখির্‌রূণা লিল আযক্বানি ইয়াবকূনা ওয়া ইয়াযীদুহুম খুশুআন।

অর্থাৎ তারা কাঁদতে কাঁদতে মুখ চিবুকের (মুখমন্ডলের) ওপর পড়ে যায় এটি তাদের নম্রভাবকে আরো বাড়িয়ে দেয় (বনি ইসরাঈল ১১০)।

হাদীস ঃ

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন একবার হযরত নবী করীম (স.) এমন এক ভাষণ দিলেন, যে ধরনের ভাষণ আমি আর কখনো শুনিনি। তিনি (সা.) বলেন আমি যা জানি, তোমরা যদি তা জানতে পারতে তাহলে হাসতে খুবই কম কিন্তু কাঁদতে খুব বেশি। বর্ণনাকারী বলেন এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাহাবীগণ কাপড়ে মুখ ঢাকলেন এবং ডুকরে কাঁদতে লাগলেন। (বোখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্ তাআলা মানবজাতিকে তাঁর আবদ্ হবার জন্য সৃষ্টি করেছেন। খুবই অল্প সংখ্যক লোক আছে যারা সর্বদা আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির ভয়ে ভীত থাকেন। পবিত্র কুরআন পাঠে জানা যায় যারা আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা করে ও পাপে লিপ্ত থাকে তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি নির্ধারিত আছে। মানুষের আত্মা দুর্বল। তাই সে সর্বদা নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে না। সে ভবিষ্যৎ এর ব্যাপারে জানে না, তাই সে তার ইচ্ছানুযায়ী আচরণ করে থাকে। তবে যারা আল্লাহ্‌কে মানে, তাঁর সন্তুষ্টি, অসন্তুষ্টি সম্বন্ধে জানে তারা সর্বদা খোদার ভয়ে ভীত থাকে। বিগলিত চিত্তে দোয়া ও কান্নাকাটির মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি চায়, তাঁর রহমত চায়।

কান্নাকাটি মানুষের হৃদয়কে নম্র করে বিনয় সৃষ্টি করে। তাই পবিত্র কুরআন মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছে, মু'মিন খোদার দরবারে কান্নাকাটি করে তাঁর শাস্তি হতে বাঁচার কামনা করে। এর ফলশ্রুতিতে খোদাতাআলা তাদের হৃদয়কে নম্র করে দেন এবং তাঁর অসন্তুষ্টির ভাবকে আরো বাড়িয়ে দেন।

> ***আল্লাহ্‌তাআলা মানবজাতিকে তাঁর আবদ্ হবার জন্য সৃষ্টি করেছেন। খুবই অল্প সংখ্যক লোক আছে যারা সর্বদা আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির ভয়ে ভীত থাকেন।***

হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন মানুষ এ পৃথিবীতে হেলায় অনেক সময় নষ্ট করে। পৃথিবীর ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে খোদা থেকে বিমুখ থাকে। মানুষ যদি জানতে পারতো এর বিনিময়ে পরকালে তাদের জন্য কী অবধারিত আছে তবে তারা খোদা থেকে বিমুখ হতো না বরং খোদার শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য কান্নাকাটি করত।

আমাদের সকলের উচিৎ **মালিকি ইয়ামিদ্দীন-**কে স্মরণ করি আর সেই দিনের বিচার হতে বেঁচে যাবার জন্য খোদার দরবারে কান্নাকাটি করি।

আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সকলকে এর তৌফিক দান করুন। আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ

আলহাজ্জ মাওলানা সালেহ আহমদ

মুরব্বী সিলসিলা

অমৃতবাণী
হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

"...আল্লাহ্ তাআলা এ যুগে খৃস্টানদের ভ্রষ্টতাকে বিভিন্ন প্রকার ঔদ্ধত্যের আকারে প্রকাশ পেতে দেখেছেন। তিনি দেখেছেন, তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে, একই সাথে সৃষ্টির একটি বিরাট অংশকেও পথভ্রষ্ট করেছে আর তারা অনেক বড় ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে এবং চরম অরাজকতা ও ধর্মহীনতার প্রসার ঘটাচ্ছে। তারা সমুজ্জ্বল ইসলামী শরীয়তের ওপর আক্রমণ করেছে আর পাপ ও লাগামহীন কু-প্রবৃত্তির দুয়ার খুলে দিয়েছে। এ ভয়াবহ নৈরাজ্যের সময় মহিমান্বিত খোদার আত্মাভিমান নিজ মহিমা প্রদর্শন করেছে। এর পাশাপাশি মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলাও চরম রূপ ধারণ করেছিল। এরা মতভেদের মাধ্যমে সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলের (সা.) ধর্মকে বহুধা বিভক্ত করেছে। এদের একে অন্যদের বিরুদ্ধে দুষ্কৃতকারীর মত আক্রমণ করেছে। আল্লাহ্ তাআলা আমাকে এদের মতভেদ দূর করার জন্য মনোনীত করেছেন এবং আমাকে ন্যায় বিচারের উদ্দেশ্যে মীমাংসাকারী ও সুবিচারক নিযুক্ত করেছেন। সুতরাং মুহাম্মদ (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণে আমি মু'মিনদের জন্য আগত সেই ইমাম' আর আমিই খৃষ্টান ও তাদের লালনকারীদের জন্য অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনকারী সেই 'মসীহ্'।

আল্লাহ্ তাআলা আমাকে এদের মতভেদ দূর করার জন্য মনোনীত করেছেন এবং আমাকে ন্যায় বিচারের উদ্দেশ্যে মীমাংসাকারী ও সুবিচারক নিযুক্ত করেছেন।

যেভাবে আমার যুগে নৈরাজ্যের দু'টো আগুন প্রকাশিত হয়েছে ঠিক সেভাবে আমার প্রভুও আমার মাঝে দু'টো নামের সমাহার ঘটিয়েছেন। দু'জগতের স্রষ্টা আল্লাহ্র কসম! এটিই সত্য। আমি তাঁর কল্যাণের জ্যোতিকে প্রসারিত করতে এসেছি। আমার প্রভু আমাকে তাঁর নির্ধারিত সময়ে বেছে নিয়েছেন। আমি মহাসম্মানিত খোদার অনুগ্রহকে প্রত্যাখ্যান করতে পারি না। আর আমার পক্ষে দয়ালু খোদার ইচ্ছার বিরোধিতা করা অসম্ভব। আমি গোসলদাতার হাতে শুধু এক মরা লাশের মত। সর্বশক্তিমান খোদা আমায় যেভাবে চালান আমি প্রতি নিয়ত সেভাবে চলি। আমি মুসলমানদের সীমাহীন বিদা'তের সময় এবং খৃষ্টানদের সৃষ্ট নৈরাজ্যের যুগে এসেছি। তোমার যদি সন্দেহ থাকে, তাহলে দক্ষ গবেষকের ন্যায় আমাদের স্বজাতি যেসব বিদা'তে নিমজ্জিত তা এবং ক্রুশ পূজারীদের অজ্ঞতাপূর্ণ কথাবার্তার দিকে গভীরভাবে দৃষ্টিপাত কর। তুমি কি ক্রমাগত বিশৃঙ্খলা দেখতে পাচ্ছো না? বিগত শতাব্দীগুলোতে তুমি কি এর কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাও? তোমার কী হয়েছে? তুমি বুদ্ধিমানদের মত কেন চিন্তা কর না এবং সুবিচারকদের দৃষ্টিতে কেন দেখ না? নিশ্চয় প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে আল্লাহ্ তাআলা ধর্মের সংস্কারক প্রেরণ করেন। যেক্ষেত্রে সাহায্যকারী খোদার রীতি এভাবেই কার্যকর সেক্ষেত্রে তুমি কিভাবে ভাবতে পারো, আল্লাহ্ এ ঝড়ের সময় তত্ত্বজ্ঞানীদের কাউকে পাঠান নি? সত্য কথা হলো, অপরাধীদের শাস্তিদাতা আল্লাহ্কে তুমি ভয় কর না।

(সিররুল খিলাফাহ্ পুস্তকের বাংলা সংস্করণ, পৃঃ ৭৬-৭৭ থেকে উদ্ধৃত)

তোমাদের মধ্য থেকে সর্বোত্তম সে যে তার স্ত্রীর সাথে উত্তম আচরণ করে এবং তোমাদের মধ্য হতে আমি আমার পরিবারের সাথে সবচেয়ে উত্তম ব্যবহার করি

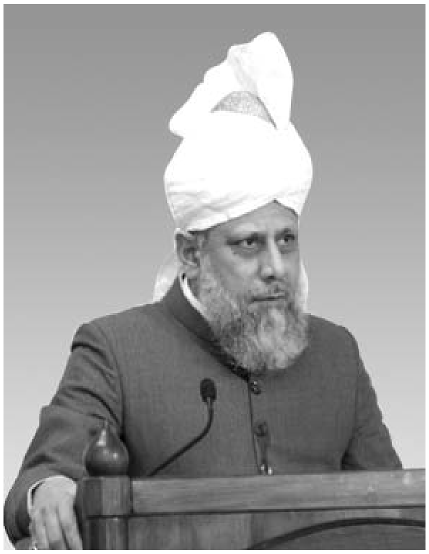

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের লন্ডনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ১৫ মে, ২০০৯-এর (১৫ হিজরত, ১৩৮৮ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

[بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ] (آمين)

গত খুতবায় আমি আল্লাহ্ তাআলার *'ওয়াসে'* বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষাপটে পবিত্র কুরআনে যেসব বিষয় এবং আদেশ-নিষেধ বর্ণিত হয়েছে তা উল্লেখ করেছিলাম। একই ধারাবাহিকতায় আজও এমন কতক আয়াত তুলে ধরবো যাতে বিভিন্ন ধরনের সেসব বিষয় বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথেও সম্পর্ক রাখে আর আমাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার সাথেও সম্পর্কিত।

আল্লাহ্ তাআলা সবিশেষ জ্ঞাত হবার কারণে আমাদের প্রতিটি কর্ম সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। তিনি এসব বিষয় এবং আদেশ-নিষেধ দিয়ে আমাদেরকে সেই পথের দিশা দিয়েছেন, যার উপর পরিচালিত হলে আল্লাহ্ তাআলার অফুরন্ত আশিস হতে আমাদের স্ব-স্ব যোগ্যতানুযায়ী আমরা অংশীদার হতে পারি, তা অর্জন করতে পারি, তা হতে কল্যাণমন্ডিত হতে পারি এবং আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হতে পারি।

আল্লাহ্ তাআলা এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদেরকে আমাদের দাম্পত্য জীবন, সামাজিক জীবন ও আমাদের ধর্মীয় বিষয়াদি সঠিকভাবে পরিচালিত করার দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। আমাদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অবস্থা আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি মোতাবেক রূপায়িত করার দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। বস্তুত মানব জীবনের যত দিক রয়েছে খোদা তাআলা সেগুলোকে সম্পূর্ণভাবে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং এ সব বিষয়ে আমাদেরকে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

মানুষকে যেহেতু আল্লাহ্ তাআলা তাঁর গুণে গুণান্বিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তাই তাকে বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষাপটে নিজের আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক পরাকাষ্ঠাসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে নিজ চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও কর্মকান্ডকে ব্যাপকতর করার আদেশ দিয়েছেন, যাতে মানুষ আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য অর্জন করতে পারে। কিন্তু একইসাথে আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে এ কথাও বলেছেন যে, যেহেতু আমি তোমাদের যোগ্যতা সম্পর্কে অবহিত তাই তোমাদের উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছি তা তোমাদের সাধ্যাতীত নয়। এছাড়া প্রত্যেক মানুষের যোগ্যতা বা ক্ষমতা সমান নয়। যোগ্যতা যেহেতু সমান নয় তাই আল্লাহ্ তাআলা যখন নির্দেশ দেন তখন ততটুকুই দেন যতটুকু পালন করার শক্তি সে রাখে। কিন্তু যোগ্যতার পরিসীমা নির্ধারণ করা কোন মানুষের কাজ নয়। একমাত্র আল্লাহ্ তাআলা-ই প্রত্যেকের সামর্থ্য ও যোগ্যতা সম্পর্কে জ্ঞাত।

এ জন্য আল্লাহ্ তাআলা যেসব আদেশ-নিষেধ নাযিল করেছেন তা সম্পর্কে এটা বলা যাবে না যে, এটি আমাদের

জন্য সাধ্যাতীত। প্রত্যেক মানুষের মাঝে আল্লাহ্ তাআলা সুপ্ত যোগ্যতা রেখে দিয়েছেন। এর বহিঃপ্রকাশ ঘটানো, পরিস্ফুটন এবং একে উজ্জ্বলতর করার দায়িত্ব মানুষের।

আল্লাহ তাআলা মহানবী (সা.)-এর কথা উল্লেখপূর্বক যেখানে আমাদেরকে বলেছেন যে, তিনি (সা.) তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ সেখানে সেই কামেল বা পরিপূর্ণ মানবের উত্তম আদর্শ মোতাবেক পরিচালিত হবার নির্দেশও আমাদেরকে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলা একজনই পরিপূর্ণ মানব সৃষ্টি করেছেন, তাঁর যোগ্যতা ও সামর্থ্যের যে পরিধি তার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। আমরা তাঁর (সা.) জীবনের যে আঙ্গিক নিয়েই ভাবি না কেন তাঁকে আমরা একটি সুমহান মার্গে দেখতে পাই। আমাদের জন্য নির্দেশ হচ্ছে, মহানবী (সা.)-এর সত্তা তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ, সে মোতাবেক চলা তোমাদের জন্য আবশ্যক। চেষ্টা করো, সাধ্যানুযায়ী এর উপর প্রতিষ্ঠিত হও।

আমি প্রারম্ভেই বলেছি, আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে যে সব বিষয়ে দিকনির্দেশনা দান করেছেন তার ভেতর পারিবারিক বিষয়াদিও রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমি পবিত্র কুরআনের কতক আয়াত উপস্থাপন করবো কিন্তু সেগুলো উপস্থাপনের পূর্বে তিনি (সা.) তাঁর পরিবারের সাথে কিরূপ ব্যবহার করতেন এবং সে প্রেক্ষাপটে আমাদের সম্মুখে মহানবী (সা.)-এর যে উত্তম জীবনাদর্শ রয়েছে এবং তিনি (সা.) যে উন্নত মান প্রতিষ্ঠা করেছেন তা তুলে ধরবো।

তিনি (সা.) একবার বলেছিলেন, **'তোমাদের মধ্য থেকে সর্বোত্তম সে যে তার স্ত্রীর সাথে উত্তম আচরণ করে এবং তোমাদের মধ্য হতে আমি আমার পরিবারের সাথে সবচেয়ে উত্তম ব্যবহার করি।'** *(সুনান তিরমিযী– কিতাবুল মানাকেব)*

এরপর তিনি (সা.) আমাদেরকে উপদেশ দিয়ে বলেন, **'তোমরা পরস্পরের মাঝে যদি কোন প্রকার দোষ-ত্রুটি দেখতে পাও অথবা অপর জনের অভ্যাস বা আচার-ব্যবহার অপছন্দনীয় হলে এমন অনেক বিষয়ও থেকে থাকবে যা তোমাদের ভাল লাগে।'** *(মুসলিম– কিতাবুন্ নিকাহ্)*

'হে আল্লাহ্! তুমি তো জানো এবং দেখো যে, মানবীয় প্রচেষ্টার সীমার মধ্যে থেকে সমতা ও ন্যায়নীতিসুলভ বন্টনের সম্পর্ক যতটুকু আছে– তা আমি করি। হে আমার প্রভু! মনের উপর আমার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, কারো কোন বিশেষ গুণ, যোগ্যতা বা বৈশিষ্ট্যের কারণে মন যদি কারো প্রতি বেশি ঝুঁকে যায় তবে তুমি আমাকে ক্ষমা করো।'

অতএব এই ভাল দিকগুলোকে সামনে রেখে ত্যাগের মন মানসিকতা গড়ে তোলা উচিত আর সমঝোতার পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এই আদেশ নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য। তাঁর (সা.) সহধর্মিনীগণ এ কথার সাক্ষী যে, তিনি সর্বদা তাঁদের সাথে উত্তম ব্যবহার করেছেন। **'সফরে যাওয়ার সময় লটারী করে স্ত্রীদের মধ্য হতে যে স্ত্রীর নাম উঠতো তাঁকে সাথে নিয়ে যেতেন।'** *(বুখারী– কিতাবুল মাগাযী)*

'স্ত্রীদের অসুস্থতার সময় তাদের সেবা শুশ্রূষা করতেন।'

(বুখারী– কিতাবুল মাগাযী)

তাঁদের আবেগ অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন কিন্তু এরপরও তিনি (সা.) এই দোয়া করতেন, **'হে আল্লাহ্! তুমি তো জানো এবং দেখো যে, মানবীয় প্রচেষ্টার সীমার মধ্যে থেকে সমতা ও ন্যায়নীতিসুলভ বন্টনের যতটুকু সম্পর্ক আছে– তা আমি করি। হে আমার প্রভু! মনের উপর আমার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, কারো কোন বিশেষ গুণ, যোগ্যতা বা বৈশিষ্ট্যের কারণে মন যদি কারো প্রতি বেশি ঝুঁকে যায় তবে তুমি আমাকে ক্ষমা করো।'**

(আবু দাউদ– কিতাবুন্ নিকাহ্)

হযরত খাদীজাহ্ (রা.)-এর সাথে যে প্রগাঢ় সম্পর্ক ছিল সে সম্পর্কে হযরত আয়শা (রা.)-কে উত্তর দিয়েছেন, **'খাদীজাহ্ (রা.) আমায় তখন সঙ্গ দিয়েছেন যখন আমি নিঃসঙ্গ ছিলাম। তিনি সাহায্যকারিনী হিসেবে আমার পাশে তখন দাঁড়িয়েছেন যখন আমার সাথে কেউ ছিলনা। আমার জন্য তিনি তাঁর সম্পদ নির্দ্বিধায় উৎসর্গ করেছেন। তাঁর গর্ভে আল্লাহ্ তাআলা আমাকে সন্তান-সন্ততিও দান করেছেন। সারা পৃথিবী যখন আমাকে মিথ্যা বাদী আখ্যায়িত করেছে তখন তিনি আমায় সত্যায়ন করেছেন।'**

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল)

মূল্যায়নের এই চেতনা তাঁর উদার মনে সবসময় জাগ্রত ছিল। যদিও তাঁর (সা.) জীবিত এবং যুবতী স্ত্রীগণ ছিলেন আর প্রিয়তমা স্ত্রীও (হযরত আয়েশার দিকে ইঙ্গিত) সাথে ছিলেন। **সেই স্ত্রীর সবচেয়ে প্রিয় হওয়ার কারণ হলো, তাঁর কক্ষেই খোদা তাআলার ওহী সবচেয়ে বেশী অবতীর্ণ হয়েছে।**

(তিরমিযী– কিতাবুল মানাকেব)

তিনি [আয়শা (রা.)] যখন বললেন,

'আপনার জীবিত স্ত্রীগণ থাকা সত্ত্বেও আপনি কেন সেই বৃদ্ধার কথা আওড়াতে থাকেন? তখন অত্যন্ত কোমলভাবে তাঁকে বুঝিয়ে বলেন, সংকীর্ণ মনের পরিচয় দিও না, উদার হবার চেষ্টা করো। অমুক, অমুক কারণে আমি আমার প্রথম স্ত্রীর স্মৃতিচারণ করি এবং তাকে স্মরণ করি।'

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল)

অধুনা যে সব ধর্মযাজক এবং অপবাদ আরোপকারীরা মহানবী (সা.)-এর উপর বাজে কথাবার্তায় সীমা ছাড়িয়ে গেছে, আমার মনিবের এই সর্বোত্তম আর্দশ কি তাদের চোখে পড়ে না ! কীভাবে তিনি তাঁর পরিবারের অধিকার প্রদান করেছেন? জীবিত স্ত্রীগণের সাথেও সমান ব্যবহার করেছেন। মনের উপর কারো জোর খাটে না ঠিকই তা সত্ত্বেও বাহ্যিক আচার-ব্যবহারের ভারসাম্য বজায় রেখেছেন। আর যে স্ত্রী প্রারম্ভেই সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর ত্যাগের কথা স্মরণ করে জীবিত স্ত্রীগণকেও জানিয়ে দিয়েছেন যে, আমি তাঁর মূল্যায়নকারী। যদি আমি এর মূল্যায়ন না করি তবে সেই খোদার কৃতজ্ঞ বান্দা বলে গণ্য হতে পারবো না, যিনি কখনও আমায় খালিহাত রাখেন নি বরং তাঁর অপরিসীম নিয়ামতের ভাগী করেছেন।

মহানবী (সা.) স্ত্রীগণের সাথে যে উত্তম ব্যবহার করেছেন এর কারণ হলো আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, ন্যায় বিচার বা ইনসাফের দাবী রক্ষা কর। তিনি যেখানে স্বীয় মান্যকারীদের নির্দেশ দিয়েছেন যে এটা আল্লাহ্ তাআলারনির্দেশ, এর উপর আমল কর; সেখানে নিজেও এর উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা যে স্থানে একাধিক বিয়ের অনুমতি দিয়েছেন সেখানে বিভিন্ন শর্তও আরোপ করেছেন। ইসলাম ও মহানবী (সা.)-এর উপর আপত্তি করা হয় যে, একাধিক বিয়ের অনুমতি দিয়ে নারীজাতির উপর অন্যায় করা হয়েছে অথবা কেবল পুরুষের আবেগ অনুভূতিকেই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

(সূরা আন্ নিসা:৪)

অর্থ, **যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, এতীমদের ব্যাপারে ন্যায়-বিচার করতে পারবে না তবে তোমরা (অন্য) নারীদের মধ্য থেকে পছন্দমত দু'জন, তিনজন বা চারজনকে বিয়ে কর; কিন্তু তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে তোমরা ন্যায়-বিচার করতে পারবে না, তবে একজনই যথেষ্ট অথবা তোমাদের ডান হাত যাদের মালিক হয়েছে তাদের বিয়ে কর। তোমাদের জন্য অবিচার এড়ানোর এটি নিকটবর্তী ব্যবস্থা ।**

প্রথমত: এই আয়াতে প্রধাণতঃ এতীম মেয়েদের নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে। এতীমদের বিয়ে কর কিন্তু অন্যায়ের বশবর্তী হয়ে নয় বরং তাদের পুরো প্রাপ্য প্রদান করে বিয়ে কর। আর বিয়ের পর তাদের আবেগ-অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকো আর কখনো মনে করো না, কখনো এটি যেন মাথায় না আসে যে, এদের খোঁজ-খবর নেয়ার যেহেতু কেউ নেই তাই তাদের সাথে যাচ্ছেতাই ব্যবহার করা যাবে। আর নিজের অভ্যাস বশতঃ যদি আশঙ্কা কর এবং যদি এই সন্দেহ থাকে যে সুবিচার করতে পারবে না, তাহলে স্বাধীন নারীদের বিয়ে কর। ন্যায়-বিচারের দাবী পূরণ সাপেক্ষে দুই, তিন এবং চারজন পর্যন্ত বিয়ে করার অনুমতি আছে। যদি ইনসাফ করতে না পার তাহলে একের অধিক বিয়ে করো না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ প্রসঙ্গে বলেন:

'যেসব এতীম মেয়েদের তোমরা লালন-পালন কর তাদেরকে বিয়ে করতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু যদি লাওয়ারিশ (পরিচয়হীন) হওয়ার কারণে তোমাদের নফস তাদের উপর অত্যাচার করবে বলে আশঙ্কা কর তাহলে এমন নারীদের বিয়ে কর যাদের পিতা-মাতা ও জ্ঞাতি-গোষ্ঠি আছে। যারা তোমাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে আর তোমরাও তাদের ব্যাপারে সাবধান থাকবে। ন্যায়-বিচারের শর্ত সাপেক্ষে এক, দুই, তিন ও চারটি পর্যন্ত (বিয়ে) করতে পার। যদি সুবিচার করতে না পার তাহলে প্রয়োজন থাকলেও একটিতেই সন্তুষ্ট থাকো।' (ইসলামী নীতি দর্শন-রূহানী খাযায়েন, ১০ম খন্ড–পৃ:৩৩৭)

'যদিও প্রয়োজন থাকুক না কেন' এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বাক্য। এখন দেখুন! যুগের হাকাম ও ন্যায়বিচারক সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, প্রয়োজনের অজুহাতে তোমরা বিয়ে করতে চাও; কিন্তু স্মরণ রেখো যে তা আসল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, বরং সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা এবং ইনসাফই হল মুখ্য বিষয়।

আজকাল কোন না কোন স্থান হতে এই অভিযোগ আসতে থাকে যে, সন্তান-সন্ততি থাকা সত্ত্বেও স্বামী বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে বিয়ে করতে চায়। প্রথম কথা যা বলেছেন তা হলো, যদি

সুবিচার করতে না পার, তাহলে বিয়ে করবে না। আর ইনসাফ বলতে সকল প্রকার অধিকার প্রদান করা বুঝায়। যদি সংসার চালানোর মত আয়ই না থাকে তাহলে আরেকটি বিয়ের বোঝা কাঁধে নেয়া প্রথম স্ত্রী এবং সন্তানদের অধিকার হরনের নামান্তর।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেছেন যে, **'বাধ্যবাধ্যকতা হেতু যদি দ্বিতীয় বিবাহ করতেই হয় তাহলে এমতাবস্থায় প্রথম স্ত্রীর প্রতি পূর্বের তুলনায় অধিক যত্নবান হও।'** *(মলফুযাত-৩য় খন্ড-পৃ:৪৩০, নবসংস্করণ)*

কিন্তু বাস্তবে আজকাল আমরা সমাজে যা দেখি তা হলো, প্রথম স্ত্রী এবং সন্তানদের অধিকার প্রদানের প্রতি ক্রমান্বয়ের ঔদাসীন্য পূর্ণ ঔদাসীন্যে রূপ নিচ্ছে আর আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশের পরিপন্থী কাজ করছে। অতএব এটি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন, আর্থিক প্রয়োজন মিটানো এবং অন্যান্য অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে অবিচার হবে না তো?

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'আমাদের দৃষ্টিতে নিজেকে পরীক্ষায় না ফেলাই মানুষের জন্য উত্তম।'** *(আল্ হাকাম-২য় খন্ড, প্রকাশিত সংখ্যা ২-৬ মার্চ, ১৮৯৮)*

অর্থাৎ এখানে দ্বিতীয় বিয়ে করে পরীক্ষায় পড়ার কথা বুঝানো হয়েছে। অতএব স্ত্রীর অধিকার প্রদান করা এত বড় একটি দায়িত্ব যে, তা প্রদান না করে মানুষ পরীক্ষায় নিপতিত হয় অথবা হতে পারে এবং খোদা তাআলার অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে। আমি মহানবী (সা.)-এর একটি দোয়ার কথা উল্লেখ করেছিলাম। তিনি (সা.) আল্লাহ্ তাআলার কাছে এই দোয়া করতেন, বাহ্যত আমি প্রত্যেকের অধিকার প্রদানের চেষ্টা করি, কিন্তু কোন স্ত্রীর কোন গুণের কারণে কতক বিষয় যদি প্রকাশ পায়, যা আমার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত তাহলে এমতাবস্থায় আমাকে ক্ষমা করো। আর এটি এমন এক বিষয় যা সম্পূর্ণভাবে মানব প্রকৃতি সম্মত। আর খোদা তাআলা যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং একাধিক বিয়ের অনুমতি দিয়েছেন, যিনি বান্দার হৃদয় এবং অন্তরের অন্তঃস্থল সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত; তিনি এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে,

'যেসব এতীম মেয়েদের তোমরা লালন-পালন কর তাদেরকে বিয়ে করতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু যদি লাওয়ারিশ (পরিচয়হীন) হওয়ার কারণে তোমাদের নফস তাদের উপর অত্যাচার করবে বলে আশঙ্কা কর তাহলে এমন নারীদের বিয়ে কর যাদের পিতা-মাতা ও জ্ঞাতি-গোষ্ঠি আছে। যারা তোমাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে আর তোমরাও তাদের ব্যাপারে সাবধান থাকবে। ন্যায়-বিচারের শর্ত সাপেক্ষে এক, দুই, তিন ও চারটি পর্যন্ত (বিয়ে) করতে পার। যদি সুবিচার করতে না পার তাহলে প্রয়োজন থাকলেও একটিতেই সন্তুষ্ট থাকো।'

এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে বা পরিস্থিতির কারণে তোমরা একজনের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হতে পারো! এমতাবস্থায় আবশ্যকীয় বিষয় হলো– তার জাগতিক প্রাপ্য অধিকার পরিপূর্ণ ভাবে প্রদান কর। যেমনটি সূরা আন্ নিসাতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ؕ وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۱۳۰﴾

(সূরা আন্ নিসা:১৩০)

অর্থ: তোমরা যতই আকাঙ্খা কর না কেন, স্ত্রীগণের মধ্যে তোমরা কখনো (পূর্ণ) সমতা রক্ষা করতে পারবে না। সুতরাং তোমরা (একই স্ত্রীর প্রতি) পূর্ণরূপে ঝুঁকে যেও না যার ফলে তোমরা তাকে (অন্য স্ত্রীকে) দোদুল্যমান বস্তুর ন্যায় ছেড়ে দাও। আর যদি তোমরা পরস্পরের মধ্যে মীমাংসা কর এবং তাক্ওয়া অবলম্বন কর, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

অতএব এমন বিষয়, যা মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে সেক্ষেত্রে পরিপুর্ণ ন্যায়-বিচার করা সম্ভব নয়। কিন্তু যা মানুষের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে সেক্ষেত্রে ন্যায়-বিচার একান্ত আবশ্যক। আর বাহ্যিক ইনসাফ, যেমনটি আমি বলেছি পানাহার, পোশাক, বাসস্থান এবং সময় ইত্যাদি এর অন্তর্ভূক্ত। যদি কেবল খরচপত্র দাও কিন্তু সময় না দাও তাহলে এটিও যথার্থ নয়। আর যদি শুধু বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দাও, সংসারের খরচাদি না দিয়ে মহিলাকে মানুষের কাছে হাত পাততে বাধ্য করা হয়, তবে এটিও সঙ্গত নয়। সুতরাং সাংসারিক দৃষ্টিকোণ থেকে দায়িত্ব পালন করা পুরুষের কর্তব্য।

একটি হাদীসে এসেছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, **'যার দু'জন স্ত্রী রয়েছে, সে যদি শুধু এক জনের প্রতি আকর্ষণ রাখে এবং দ্বিতীয় জনকে উপেক্ষা করে তাহলে কিয়ামত দিবসে শরীরের একটি অংশ কর্তিত অথবা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে।'** *(সুনান নেসাঈ)*

অতএব আল্লাহ্ তাআলা বলেন, ত্বাক্ওয়া হচ্ছে– উভয়ের বাহ্যিক অধিকার সমানভাবে প্রদান করা আর কোন স্ত্রীকে এভাবে উপেক্ষা না করা

যে, স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও সে সকল প্রকার প্রাপ্য অধিকার হতে বঞ্চিত থাকবে। না তাকে তালাক দিচ্ছ আর না-ই যথার্থভাবে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করছো। একজন মু'মিনের রীতি এরূপ হওয়া উচিত নয়। সুতরাং মু'মিনের দায়িত্ব হল সেসব কাজ এড়িয়ে চলা যা করতে আল্লাহ্ তাআলা বারণ করেছেন আর আত্মসংশোধন করা।

শুধু একজন স্ত্রী'র প্রতিই অধিক মনোযোগ দেয়া এবং অন্য স্ত্রীর প্রতি খেয়াল না রাখার ব্যাপারে বিভিন্ন অভিযোগ আসে। দু'জন নয় বরং কোন কোন ক্ষেত্রে এক স্ত্রীর ক্ষেত্রেও অনেক সময় স্ত্রী'র কোন কথার অজুহাতে, এমন সব দাম্পত্য কলহ দেখা যায়; বলা হয় যে, আমি তোমাকে তালাকও দিব না আর তোমাকে নিয়ে ঘরসংসারও করবো না। আবার কাযা বোর্ডে অথবা আদালতে মামলা পেশ হলে অকারণে মামলা দীর্ঘ দিন ঝুলিয়ে রাখা হয়। এমন অজুহাত বা বাহানা খুঁজে বের করা হয় যাতে মামলা দীর্ঘায়িত হতে পারে। পূর্বেও আমি কয়েকবার বলেছি, অনেককে তালাক দেয়া হয় না এজন্য যাতে সে (স্ত্রী) নিজেই খোলা নিয়ে নেয় আর এভাবে সে দেনমোহর এড়িয়ে যেতে পারে। অতএব এগুলো এমন বিষয় যা মানুষকে ত্বাকওয়া থেকে বঞ্চিত করে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, আত্মসংশোধন কর, যদি নিজের জন্য আল্লাহ্ তাআলারদয়া ও ক্ষমা প্রত্যাশা কর, তাহলে তুমিও দয়া প্রদর্শন করো আর স্ত্রী'কে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করে তাকে নিয়ে সংসার করো। যদি আল্লাহ্ তাআলারব্যাপক দয়া হতে অংশ পেতে হয় তাহলে নিজের দয়াকেও ব্যাপকতর করো।

আমি যে আয়াত পাঠ করেছি তার পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهٖ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا (١٣١)

(সূরা আন্ নিসা:১৩১)

অর্থ: এবং যদি তারা একে অপর হতে পৃথক হয় তাহলে আল্লাহ্ তাদের প্রত্যেককে তার যোগ্যতানুযায়ী প্রাচুর্য দিয়ে স্বনির্ভর করে দিবেন। বস্তুত: আল্লাহ্ প্রাচুর্যদাতা, প্রজ্ঞাময়। এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, যদি সংশোধনের কোন পথই খোলা না থাকে তাহলে ***'কালমুয়াল্লাকাহ্'*** অর্থ্যাৎ ঝুলিয়ে রেখো না। তাকে তার প্রাপ্য প্রদান করে সুন্দরভাবে বিদায় করো। যদি কোন পুরুষ তাকে ঝুলিয়ে রাখে তাহলে এমন পরিস্থিতিতে স্ত্রী-ও কাজীর মধ্যস্থতায় খোলা নেয়ার অধিকার রাখে।

> ***'স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ-বিচ্ছেদ আল্লাহ্ তাআলার দৃষ্টিতে চরম অপছন্দনীয় কাজ'***

যাহোক, আল্লাহ্ তাআলা বলেন মু'মিন পুরুষ এবং মু'মিন নারী যদি প্রেম-প্রীতি এবং ভালবাসার সাথে জীবন যাপনের চেষ্টা করে তাহলেই ত্বাক্ওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত বলে বিবেচিত হবে। আর যদি সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়, তাহলে পরস্পর একান্ত ভদ্রতার সাথে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। পুরুষের উচিত সুন্দরভাবে নারীর প্রাপ্য অধিকার দিয়ে তাকে পৃথক করে দেয়া, কেননা এটিই পুরুষের কর্তব্য এবং নারীর প্রাপ্য অধিকার। আর যেহেতু ত্বাক্ওয়ার দাবী অনুসারে কাজ করা সত্ত্বেও একত্রে বসবাসের সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে ফলে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটছে। তাই আল্লাহ্ তাআলা বলেন, তিনি স্বীয় অফুরন্ত দয়া ও কৃপা দ্বারা নর ও নারী উভয়ের জন্য সর্বোত্তম ব্যবস্থা করবেন এবং তাদেরকে নিজ সন্নিধান থেকে প্রাচুর্যশীল করবেন এবং পরমুখাপেক্ষিতা থেকে রক্ষা করবেন। যদিও একটি হাদীসের আলোকে **'স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটা আল্লাহ্ তাআলারদৃষ্টিতে চরম অপছন্দনীয় কাজ।'** *(আবু দাউদ কিতাবুত ত্বালাক)* কিন্তু যেহেতু ত্বাক্ওয়ার উপর পরিচালিত হয়ে এ সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে এ কারণে খোদা তাআলা যিনি অন্তর্যামী, তাঁর প্রতি যখন বিনত থেকে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেই হলো অর্থাৎ উপায়ান্তর না থাকায় বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাতে হয়েছে এমন ক্ষেত্রে তিনি প্রাচুর্যশীল হওয়ার বা উভয়ের জন্য পুনরায় প্রাচুর্যের বিধান করবেন। যেহেতু তিনি প্রজ্ঞাবানও সে কারণে আল্লাহ্ তালার সাহায্য প্রার্থনা করে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তা প্রজ্ঞাপূর্ণ হয়ে থাকে, আর আল্লাহ্ তাআলারনির্দেশনার আলোকে হয়ে থাকে।

এ আয়াতে একটি মৌলিক কথা এও বলা হয়েছে যে, আবেগতাড়িত হয়ে আত্মীয়তার সিদ্ধান্ত করা উচিত নয়। পিতা-মাতা বা ছেলে-মেয়ে কারো পক্ষ হতেই আবেগের বশবর্তী হয়ে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়া উচিত নয়। বরং খোদা তাআলা যিনি সবকিছু অবহিত এবং সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন তাঁর সাহায্য নিয়ে, দোয়ার মাধ্যমে চিন্তা-ভাবনা করে আত্মীয়তা করা বাঞ্ছনীয় আর এভাবে আত্মীয়তা গড়ে উঠলে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, তিনি আপন কৃপায় এতে প্রাচুর্য দান করেন। আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে

প্রাচুর্যশীল করে দেন, তাদের সম্পদেও আল্লাহ্ তাআলা বরকত দেন আর তাদের সম্পর্ক সুমধুর করেন।

একটু আগেই আমি তালাকের উল্লেখ করেছিলাম, অনেক পুরুষ তালাকের বিষয়টিকে ঝুলিয়ে রাখে এবং প্রলম্বিত করার চেষ্টা চালিয়ে যায়। প্রথমত: বিয়ের পর, কিছুদিন পুরুষ-নারী একত্রে বসবাস করে, অনেক সময় সন্তানাদিও হয়ে যায়, তারপর তালাকের প্রয়োজন দেখা দেয়। এমন ক্ষেত্রে পুরুষকে যা দিতে হবে তার দায়-দায়িত্বের বিষয়টি সুস্পষ্ট। সন্তানদের ভরণ-পোষণ এবং দেন মোহর ইত্যাদি। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা বলেন, অনেক সময় এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যে, এখনও রুখসতী বা কন্যা-বিদায় হয়নি অথবা দেন মোহর নির্ধারিত হয়নি (এসময়ে যদি বিবাহ বিচ্ছেদ হয়) সেক্ষেত্রেও নারীর প্রাপ্য অধিকার প্রদান করো।

সূরা আল্ বাকারাতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ
أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ
قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا
عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

(সূরা আল্ বাকারা:২৩৭)

অর্থ: তোমাদের কোন পাপ হবে না যদি তোমরা স্ত্রীদিগকে ঐসময়েও তালাক দাও যখন তোমরা তাদেরকে স্পর্শ করোনি, অথবা তাদের জন্য দেন মোহর ধার্য করনি। কিন্তু তোমরা তাদেরকে উপহারস্বরূপ কিছু দিও; বিত্তবানের উপর তার ক্ষমতানুযায়ী এবং বিত্তহীনের উপর তার সাধ্যানুযায়ী – ন্যায়সংগতভাবে উপকার করা বিধেয়। এটি সৎকর্মশীলদের কর্তব্য।

এ আয়াতে খোদা তাআলা বলেন, কারণ যাই হোক না কেন পুরুষ যদি কোন মূল্যে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে না চায়, তখন সে সম্পর্ক ছিন্ন করার বেলায় নারীর প্রতি সহানুভূতিসূলভ আচরণ করা এবং নিজ সামর্থানুযায়ী তাকে উপহার প্রদান করা পুরুষের কর্তব্য। আল্লাহ্ তাআলা যদি সামর্থ দিয়ে থাকেন তাহলে পুরুষের প্রতি নির্দেশ হলো, সেই সামর্থের বহিঃপ্রকাশ আবশ্যক। যে খোদা সামর্থ দিয়েছেন যদি তোমরা তা প্রকাশ না করো তাহলে তিনি তা প্রত্যাহার করার ক্ষমতাও রাখেন। স্বাচ্ছন্দ্য থাকা সত্ত্বেও যদি প্রাপ্য অধিকার প্রদান না করো, অনুগ্রহ না করো তাহলে সেই স্বাচ্ছন্দ্যকে দারিদ্রতায় পরিবর্তন করার শক্তিও তিনি রাখেন। কাজেই আল্লাহ্ তাআলার কৃপা হতে যদি অংশ পেতে চাও নারীর প্রতি অনুগ্রহসূলভ ব্যবহার করতে গিয়ে স্বীয় স্বাচ্ছন্দ্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটাও আর যেহেতু আল্লাহ্ তাআলা কারো উপর তার সাধ্যাতীত বোঝা অর্পণ করেন না তাই বলেছেন, যদি বিত্তহীন বেশি দেবার সামর্থ না রাখে তবে নিজ সামর্থানুসারে যতটুকু বিধেয় তাই দেবে। অতএব আল্লাহ্ তাআলা বলেন, যদি তোমরা সৎকর্মশীল হও এবং খোদা ভীতির দাবী মোতাবেক কাজ করো তাহলে তোমাদের জন্য এরূপ অনুগ্রহ করা অবশ্য কর্তব্য।

স্ত্রীর অধিকার প্রদান করা এত বড় একটি দায়িত্ব যে, তা প্রদান না করায় মানুষ পরীক্ষায় নিপতিত হয় অথবা পরীক্ষায় পড়তে পারে এবং তা খোদা তাআলার অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে।

মহানবী (সা.) এ বিষয়টির উপর কত সচেতনভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তা একটি হাদীস হতে বুঝা যায়। **'একদা একজন আনসারী বিয়ে করেন তারপর স্ত্রীকে স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক দেন অথচ তখনও তার দেন মোহর নির্ধারণ করা হয়নি। বিষয়টি যখন মহানবী (সা.)-এর খিদমতে পেশ করা হয় তখন তিনি (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি অনুগ্রহ করতঃ তাকে কিছু দিয়েছ কি? সেই সাহাবী নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! তাকে দেয়ার মত আমার কাছে কিছুই নেই। একথা শুনে তিনি (সা.) বলেন, যদি কিছুই না থাকে তাহলে তোমার মাথায় যে টুপি আছে তাই দিয়ে দাও।'** ***(রূহুল মা'য়ানী–১ম খন্ড, পৃ:৭৪৫-৭৪৬)***

এথেকে বুঝা যায় যে, মহানবী (সা.) নারীর অধিকার কীভাবে সুস্পষ্ট করেছেন এবং এ সম্পর্কে কত সচেতন ছিলেন। মোটকথা হলো দেন মোহর নির্ধারিত না হলেও কিছু না কিছু দাও। আর পূর্বেই যদি দেন মোহর নির্ধারিত হয়ে থাকে তাহলে এমন পরিস্থিতিতে কি করতে হবে? এ সম্পর্কে পরের আয়াতে অত্যন্ত পরিস্কার নির্দেশনা রয়েছে অর্থাৎ দেন মোহর নির্ধারিত হয়ে থাকলে তার অর্ধেকাংশ পরিশোধ করো।

এভাবে পবিত্র কুরআন পুরুষ ও তার পরিবারের উপর নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে আর পুরুষের দায়িত্ব-কর্তব্য কি তা বলেছে। তাদের আত্মীয়স্বজন বা সন্তানদের দুধ পান করানো সম্পর্কে অত্যন্ত পরিস্কার নির্দেশনা প্রদান করেছে। অনুরূপভাবে নারীরও দায়-দায়িত্ব রয়েছে যা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। সন্তান-সন্ততি এবং স্বামী সম্পর্কে যে নির্দেশ

রয়েছে তা পালন করা নারীর জন্য কর্তব্য। পুরুষ এবং নারীর সকল অধিকার এবং পরস্পরের প্রতি যে দায়-দায়িত্ব রয়েছে তার উল্লেখ করতে গিয়ে খোদা তাআলা বলেন, আমরা তোমাদের শক্তি-সামর্থকে দৃষ্টিতে রেখে এসব দায়-দায়িত্ব অর্পণ করেছি তাই তা পালন করো। এটি বিস্তারিত একটি বিষয় যা এখন আমি বর্ণনা করবো না। এখন কেবল যে দু'টি বিষয় আমি তুলে ধরেছি তাই যথেষ্ট। এ সম্পর্কে প্রথমতঃ যা বলতে চাচ্ছি তা হলো, স্ত্রীদের অধিকার সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর আদর্শ কিরূপ? আর আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য তিনি (সা.) এসব অধিকার প্রদানের কি মহান মান প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। দ্বিতীয়তঃ সেই আদর্শের উপর পরিচালিত হবার মানসে সকল আহমদী মুসলমানকে এসব অধিকার প্রদানের প্রতি কতটা মনোযোগ নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। বিশেষভাবে সেই কর্তব্য পালনের প্রতি যা আল্লাহ্ তাআলা পুরুষের উপর ন্যস্ত করেছেন।

এখন আমি আরেকটি বিষয়ের প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই যা আল্লাহ্ তাআলার ফযলে জামাতের ভেতর সার্বজনীন না হলেও আহমদী সমাজের কোন কোন স্থান হতে এর পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনের সূরা আল্ আন্'আমে বলেন:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ
نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا
قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ

(সূরা আল্ আন্'আম:১৫৩)

অর্থঃ এবং কেবল সেই নিয়ম ব্যতীত যা সর্বোত্তম, তোমরা এতীমের ধন-সম্পদের নিকট যেও না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা প্রাপ্ত বয়সে উপনীত হয়। এবং ন্যায় সঙ্গতভাবে মাপ ও ওজন পুরোপুরি দাও আমরা কারো ওপর সাধ্যাতীত দায়িত্ব ভার অর্পন করি না। এবং যখন তোমরা কথা বল তখন তোমরা ন্যায়বিচার কর– যদিও নিকটাত্মীয়ই হোক না কেন। এবং আল্লাহ্‌র অঙ্গীকারকে পূর্ণ কর এটি সেই বিষয় যার তাগিদপূর্ণ আদেশ তিনি তোমাদেরকে দিচ্ছেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

এ আয়াতে প্রায় পাঁচটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে যা আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া প্রথম কথা যা বলেছেন তাহলো, আল্লাহ্ তাআলারঅমোঘ ঘোষণা– আমরা কারো উপর তার সাধ্যাতীত বোঝা অর্পণ করি না, যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি; বান্দাদের সামর্থ কতটুকু আর এর পরিসীমা কি তা আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় সর্বব্যাপী জ্ঞানের আলোয় অবহিত আছেন। অতএব আল্লাহ্ তাআলা যেসব আদেশ-নিষেধ দিয়েছেন তা আমাদের সাধ্যের ভেতর, যা আমরা পালন করতে সক্ষম।

এ আয়াতে যেসব বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে সর্ব প্রথম নির্দেশ হচ্ছে, সর্বোত্তম পন্থা ছাড়া এতীমের ধন-সম্পদের নিকটে যেও না। যার কাছে এতীমের সম্পদ আসে সে তার রক্ষক (আমীন)। তাই তা এতীমদের কল্যাণার্থে ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়।

আল্লাহ্ তাআলা এই আয়াতের এক-দুই আয়াত পূর্বে বলেন, তোমাদের প্রথম চেষ্টা হওয়া উচিৎ যাতে এতীমের সম্পদ সুরক্ষিত থাকে আর নিজেরা তাদের পড়াশুনা এবং লালন-পালনের ব্যবস্থা করো কিন্তু যদি কারো সঙ্গতি না থাকে আর ব্যয়ভার বহন করতে না পারে তাহলে সে অতি সাবধানে তাদের সম্পদ হতে তাদের পিছনে ব্যয় করতে পারে। কোনক্রমেই তাদের বড় হওয়ার পূর্বে তাদের সম্পদ উড়িয়ে দেয়া যাবেনা। অতএব সত্যিকার ঈমানদার সে, যে এতীমদের বড় হওয়া পর্যন্ত তাদের ধন-সম্পদ রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে আর সত্যিকার দায়িত্ব পালন তখনই সম্ভব হবে– নিজের মূলধন বিনিয়োগের সময় যেমন দরদ রাখে আর চিন্তা-ভাবনা করে ব্যবসায় বিনিয়োগ করে, ব্যবসার বা লাভের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করে অথবা লাভজনক ব্যবসায় লগ্নি করে এতিমের সম্পদের প্রতিও অনুরূপ দরদ থাকা চাই। অবশ্য ব্যবসা বলতে কেবল লাভই বুঝায় না কেননা যদি কেবল লাভের জন্য বিনিয়োগ করা হয় তাহলে তা সুদেরই নামান্তর। মোটকথা যেভাবে নিজের সম্পদের জন্য দরদ রয়েছে অনুরূপভাবে এতীমের সম্পদের জন্য দরদ থাকা উচিৎ। এতীমের সম্পদ বিনিয়োগের নির্দেশ রয়েছে যাতে ব্যবসায় উন্নতির ফলে তারা লাভবান হতে পারে অথবা তাদের সম্পদ বৃদ্ধি পায় আর যখন তারা বড় হবে তখন ব্যবসা-বাণিজ্যে যেন তারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। এরফলে সে এতীম হওয়া সত্ত্বেও সমাজের একটি মর্যাদাবান ও সম্মানিত অংশে পরিণত হবে।

কিন্তু অনেক সময় অভিযোগ আসে যে, আত্মীয়-স্বজন এতীমের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করতে গিয়ে সততার পরিচয় দেয়নি। কোন আত্মীয়ের কাছে তার এতীম ভাতিজা বা ভাগ্নে থাকলে তাদের সম্পদকে অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করা হয়। এমন লোকদের স্মরণ রাখা উচিৎ যে, এমন সম্পদ ভক্ষণ করলে তাদের অর্থ সম্পদ কখনও বৃদ্ধি পাবে না আর এই পার্থিব জগতে কোনরূপ

আর্থিক স্বার্থ সিদ্ধি হলেও তারা আল্লাহ্ তাআলার সেই সতর্কবাণীর আওতায় আসবে যাতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, যারা এতীমের সম্পদ ভক্ষণ করে

إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا

(সূরা আন্ নিসা:১১)

অর্থ: **তারা নিজেদের উদরে কেবল অগ্নি ভক্ষণ করে।** আর যারা এসব অত্যাচারীকে সাহায্য করে তারাও আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ পরিপন্থী কাজ করে। এই আয়াতের পরেই তা বর্ণিত হয়েছে,

فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى

(সূরা আল্ আন্'আম:১৫৩)

অর্থ: **তোমরা ন্যায়বিচার কর, যদিও নিকটাত্মীয়ই হোক না কেন।**

অতএব এতীমের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টি বড়ই স্পর্শকাতর। যদি কেউ অন্যায়ভাবে তা ব্যবহার করে তাহলে তার যেন কোনভাবে সাহায্য না করা হয়। এতীমদের সম্পদের হিফাযত এবং তাদের প্রাপ্ত বয়সে উপনীত হওয়ার পর ধন-সম্পদ তাদের কাছে হস্তান্তর করার নির্দেশ প্রদানের পর আল্লাহ্ তাআলা বলেন, মাপ ও ওজন ন্যায়সঙ্গতভাবে পুরোপুরি দাও। অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতারণার আশ্রয় নিও না। কেননা জাতির উপর যেসব ধ্বংসযজ্ঞ নেমে আসে সেক্ষেত্রে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতারণাও একটি কারণ হয়ে থাকে। সাহাবীদের রীতি ছিল, অনেক সময় পণ্যের ত্রুটি ক্রেতার চোখে না পড়লেও তাঁরা নিজেদের জিনিষ সম্পর্কে স্বয়ং বলে দিতেন যে, এতে এই এই খুঁত আছে যেন কোনরূপ প্রতারণা না হয়।

আদ্ল বা ন্যায়বিচারের কথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। শেষের দিকে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, আল্লাহ্ তাআলার সাথে কৃত তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করো। প্রথম কথাগুলো হচ্ছে, সমাজের উন্নতি এবং এর অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য। কিন্তু এর উপর তখনই প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব যদি এ বিশ্বাস থাকে যে, আল্লাহ্ তাআলা সেই সত্তা যাঁর জ্ঞানের পরিধি সবচেয়ে ব্যাপক। তিনি জানেন যে, কে কতটা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করছে। আল্লাহ্ তাআলার সত্তাকে দৃষ্টিতে রেখে নিজেদের অঙ্গীকার যদি রক্ষা কর তাহলেই আল্লাহ্‌র অধিকার এবং বান্দার প্রাপ্য প্রদানে সমর্থ হবে। এবং যখন এসব বিষয় তুমি বুঝবে তখনই বুঝা যাবে যে, তুমি উপদেশ গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশের উপর কঠোরভাবে অনুশীলনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছ। কোনভাবেই এ ধারণা করা উচিত নয় যে, এই কাজ আমার শক্তি ও সামর্থের উর্ধ্বে বরং আল্লাহ্ তাআলার যেসব আদেশ রয়েছে তা আমাদের সাধ্য মোতাবেক তাই সর্বদা তা পালন করার চেষ্টা করো।

যখন আমাদের চিন্তাধারা এমন হবে এবং এর উপর আমল করার চেষ্টা থাকবে তখন আমরা আল্লাহ্ তাআলার সেই প্রতিশ্রুতি ও শুভসংবাদ অনুযায়ী কেবল আর কেবলমাত্র তাঁরই কৃপা হতে অংশ লাভকারী হবো। যেখানে আল্লাহ্ তাআলা বলেন

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٤٣﴾

(সূরা আল্ আ'রাফ:৪৩)

অর্থ: **এবং যারা ঈমান আনে এবং পুণ্যকর্ম করে– আমরা কোন আত্মার উপর তার সাধ্যাতীত দায়িত্বভার অর্পণ করি না– এরাই জান্নাতের অধিবাসী; তথায় তারা চিরকাল বাস করবে।** আল্লাহ্ করুন যেন সর্বদা সেই খোদার সমীপে বিনত এবং তাঁর নির্দেশাবলীর উপর আমলকারী হই। যিনি আমাদের শক্তি এবং যোগ্যতানুসারে আমাদের আমল করার নির্দেশ দিয়েছেন। যিনি আমাদের প্রতি আমাদের সীমিত সামর্থ মোতাবেক আমলের বোঝা অর্পণ করেছেন কিন্তু পাশাপাশি স্বীয় অকূল এবং অসীম ও সুপ্রশস্ত নিয়ামতের উল্লেখ করে স্বীয় ক্ষমার চাদরে আবৃত করার সুসংবাদও প্রদান করেছেন। কাজেই ব্যাপকতর এই রহমত এবং দয়ার কারণে ঈমানে সমৃদ্ধি লাভ হচ্ছে এবং সৎকর্ম সম্পাদনের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়াই হচ্ছে আমাদের কর্তব্য। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে এর তৌফিক দিন।

(প্রাপ্ত সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্ক, লন্ডন)

তোমাদের কোন পাপ হবে না যদি তোমরা স্ত্রীদিগকে ঐসময়েও তালাক দাও যখন তোমরা তাদেরকে স্পর্শ করনি, অথবা তাদের জন্য দেন মোহর ধার্য করনি। কিন্তু তোমরা তাদেরকে উপহারস্বরূপ কিছু দিও; বিত্তবানের উপর তার ক্ষমতানুযায়ী এবং বিত্তহীনের উপর তার সাধ্যানুযায়ী – ন্যায়সংগতভাবে উপকার করা বিধেয়। এটি সৎকর্মশীলদের কর্তব্য।

দুরূদ শরীফের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী

আলেম ওলামা মুফতী মাওলানাগণ দুরূদ শরীফের ফজিলত পঞ্চমুখে বর্ণনা করে থাকেন। এই দুরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে দশটি নেকী পাওয়া যায় এবং পূর্ববর্তী দশটি গুণাহ মাফ হয়ে যায়। মঞ্চে দাঁড়িয়ে তারা দুরূদের গুণ কীর্তন করেন। বিভিন্ন ধর্মীয় সভা, ওয়াজ ও মিলাদ মাহফিলে সত্তর হাজার ফিরিশ্‌তা নামিয়া আনেন। কিন্তু দরূদ শরীফের কেন এত ফজিলত, অন্তর্নিহিত ভাবে তার তাৎপর্য কি? একটু ভেবে চিন্তে দেখুন, এই দরূদ শরীফে আল্লাহ্ তাআলার নিকট আমরা কি চাই। শুধু কি তোতা পাখির মত বুলি আওড়ানো না এর মধ্যে অন্য কোন মাহাত্ম্য বিদ্যমান আছে। এই দরূদ শরীফে আল্লাহ্ তাআলার নিকট আমরা এভাবে চাই–

“হে আল্লাহ্! আশিষ বর্ষণ কর মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি এবং তাঁর বংশধরগণের প্রতি। যদ্রুপ তুমি আশিষ বর্ষণ করেছিলে ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি এবং তাঁর বংশধরগণের প্রতি। নিশ্চয়ই তুমি মহাপ্রশংসিত মহামর্যাদাবান। হে আল্লাহ্! কল্যাণ বর্ষণ কর মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি এবং তাঁর বংশধরগণের প্রতি যেরূপভাবে তুমি কল্যাণ বর্ষণ করেছিলে ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি এবং তাঁর বংশধরগণের প্রতি। নিশ্চয়ই তুমি মহাপ্রশংসিত মহামর্যাদাবান।”

বংশধর বলতে উম্মতকে বুঝায়। তা না হলে আবুজেহেলও তাঁর (সা.) সাথে ঘনিষ্ঠরূপে সম্পর্কিতই ছিল। প্রশ্ন এই যে, বড় নবী কে? হযরত মুহাম্মদ (সা.), না ইবরাহীম (আ.)। হযরত মুহাম্মদ (সা.) সন্দেহাতীতভাবেই বড় নবী। তাহলে ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি এবং তাঁর বংশধরগণের প্রতি আল্লাহ্ তাআলা এমন কি আশিষ দান করেছিলেন, যা কি না হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর বংশধরগণের প্রতি বর্ষণ করতে সর্বদা আল্লাহ্ তাআলার নিকট করুনা ভিক্ষা করা হয়?

পবিত্র কুরআন করীমে উল্লেখ আছে “যখন ইবরাহীম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.) কাবা শরীফের ভিত্তি পুণরায় গড়েন তখন তাঁরা প্রার্থনা করেন, হে আমার প্রভু! আমাদের কাজকে কবুল কর, নিশ্চয় তুমি শ্রবণকারী ও মহাজ্ঞানী। হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে তোমার অনুগত কর এবং আমাদের বংশধর থেকে একদলকে তোমার অনুগত রেখো এবং আমাদেরকেও ইবাদত করবার প্রণালীগুলো শিখিয়ে দাও এবং আমাদেরকে ক্ষমা কর, নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু। হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের নিকট তাদের মধ্য হতে ‘রসূল’ প্রেরণ করো, যে তাদের নিকটে তোমার আয়াতসমূহ পাঠ করবে এবং তাদেরকে কিতাব ও জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা শিখাবে এবং তাদেরকে পবিত্র করবে। নিশ্চয়ই তুমি প্রবল ক্ষমতাবান ও মহাজ্ঞানী” (আল-বাকারা)

হযরত ইবরাহীম (আ.) এর দুই স্ত্রী ছিলেন। বিবি সারা ও বিবি হাজেরা। বিবি হাজেরার গর্ভে জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাইল (আ.)-এর জন্ম এবং বিবি সারার গর্ভে কনিষ্ঠপুত্র ইসাহাক (আ.)–এর জন্ম। আল্লাহ্ তাআলা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রার্থনা কবুল করেন এবং প্রথমে ইসাহাক (আ.) এর বংশে সাধারণ ভাবে হযরত ঈসা (আ.) পর্যন্ত বহু নবী রসূলের আবির্ভাব হয়। এবং পরিশেষে হযরত ইসমাঈল (আ.) এর বংশে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাব ঘটে।

হযরত ইবরাহীম (আ.) এর যুগে পূর্ব থেকেই নরবলীর প্রথা ছিল। দয়াময় আল্লাহ্ তাআলা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মাধ্যমে নরবলীর প্রথা উচ্ছেদ করে পশু কুরবানীর প্রথার প্রচলন করেন। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, যদিও বাহ্যিকভাবে আল্লাহ্ তাআলা পশু কুরবানীর মাধ্যমে নরবলীর প্রথার উচ্ছেদ করেছেন, তথাপি ইসলাম ধর্মে আধ্যাত্মিকভাবে আল্লাহর রাস্তায় মানুষকে কুরবানী হওয়া বা জীবন উৎসর্গ করার পথ প্রশস্ত করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, “পশুর রক্ত মাংস

একটি দল থাকতে হলে অবশ্যই একজন নেতা এবং একটি কেন্দ্র থাকতে হবে, যার মাধ্যমে একতা শৃংখলা বজায় রেখে সুষ্ঠুভাবে ইসলামের প্রচার কার্য চলবে। প্রশ্ন এই যে, বর্তমানে সেই একটি দল কোনটি, যাদের একজন নেতা আছে, একটি কেন্দ্র আছে, যার মাধ্যমে সংঘবদ্ধ ভাবে একতা শৃঙ্খলা বজায় রেখে সুষ্ঠু ভাবে বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজ চলছে? উত্তর হবে একমাত্র আখেরী জামানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দাবীদার হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত ব্যতীত আর কেউ নাই।

আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছায় না, আল্লাহর নিকট পৌঁছায় তাক্‌ওয়া ।" (সূরা হজ্জ) প্রশ্ন এই যে, তাক্‌ওয়াশীল কারা ? বুঝা গেল যে ঈদুল আযহিয়ার দিনে বড় বড় নামী দামী পশু জবাই করার মধ্যে কুরবানী সীমাবদ্ধ নয়। কেননা আল্লাহ্‌র নিকট জবাই করা পশুর মাংস পৌঁছায় না। এটা মানুষই ভক্ষণ করে থাকে। তবুও কুরবানীর এত গুরুত্ব কেন? কুরবানীর অর্থ ব্যাপক। এক কথায় কুরবানীর মর্মার্থ ত্যাগ। কুরবানী বা ত্যাগ ব্যতীত কোন জাতি বড় হতে পারে না। আসলে কুরবানীর মর্মার্থ প্রকৃত ভাবে যারা বুঝে তারা কখনো অন্যের বিরুদ্ধে হিংসা, বিদ্বেষ, দলাদলি, রেষারেষি, ঝগড়া কলহ, হানাহানি, মারামারি ইত্যাদি জঘন্যতম কাজ করতে পারে না। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "তারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত"। কিন্তু আজকের দিনে আমরা কি দেখছি? নাই পরস্পর সৌহার্দ্যতা, নাই একতা-শৃংখলা! নাই কোন নেতা। তারা আজ শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে হিংসা বিদ্বেষ ঝগড়া, কলহ, হানাহানি, মারামারিতে মত্ত। মঞ্চে দাঁড়িয়ে একে অন্যের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক বিষবাষ্প ছড়িয়ে মহানবী (সা.)-এর আদর্শ শিক্ষাকে ভুলুণ্ঠিত করে জগতে দুর্নাম রটাচ্ছে। বেশ ভুষণে সাধু সেজে হিংসাত্মক জঘন্যতম গর্হিত কাজ করে বেড়ায়। একে অন্যের বিরুদ্ধে বিষোদগার, সহিংসতা ব্যতীত তারা আর কিছুই বুঝে না এবং সাধারণ মানুষকেও বুঝায় না। নিজ নিজ স্বার্থে বিভিন্ন কায়দা কৌশলের মাধ্যমে ধর্মের নামে একে অন্যের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে উত্তেজিত করে তোলা তাদের স্বভাব সিদ্ধ হয়ে গেছে। আর সাধারণ সরলমনা মানুষ আখেরী জামানার মোল্লা মৌলবীদের কথাকেই অন্ধভাবে বিশ্বাস করে চলছে।

এমন একদিন ছিল যেদিন মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর হৃদ্যতাপূর্ণ ভালবাসা, একতা, শৃঙ্খলা, মমতাবোধ অক্ষুণ্ন ছিল এমনকি একজন আরেকজনের জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে দিত। কোথায় আজ সেই মুসলমান? বড় বড় ডিগ্রীওয়ালা নামধারী আলেম ওলামা মুফতি মাওলানাগণ নবী করীম (সা.) এর আদর্শ শিক্ষাদানের পরিবর্তে একে অন্যের বিরুদ্ধে হিংসা বিদ্বেষ, ঝগড়া কলহ, হানানহানি, মারামারি শিখাচ্ছে। মসজিদ আল্লাহ্‌র ঘর। আজ আমরা কি দেখছি? লম্বা জোব্বা গায়ে জড়িয়ে মুখে লম্বা দাড়ি রেখে, মাথায় লম্বা পাগড়ী পেচিয়ে আল্লাহ্‌র ঘর পবিত্র মসজিদে হানাহানি মারামারি, আত্মঘাতী হামলা এটাই কী মহানবী (সা.) এর আদর্শ ! এরাই কি তাক্‌ওয়াশীল আল্লাহ্‌র খাস বান্দা ?

হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর প্রাণ প্রিয় পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.) এবং বিবি হাজেরাকে জনমানব শূন্য বৃক্ষ-লতা বিহীন মক্কার মরু প্রান্তরে আল্লাহ্‌র রাস্তায় কুরবানী বা ত্যাগ করেছিলেন। যার ফলে ইসমাঈল (আ.) এর বংশে এক মহাজাতি গড়ে উঠে। এবং হযরত ইসমাঈল (আ.) এর বংশে মহানবী (সা.) এর আবির্ভাব ঘটে। হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "আমি ইবরাহীম (আ.) এর দোয়ারই ফল" হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং হযরত ইসমাঈল (আ.) কাবা শরীফের পুন:নির্মাণ কাজ শুরু করার কালে কৃত তাদের দোয়ার এমনি তাৎপর্য ছিলো, যার ফলে, হযরত ইবরাহীম (আ.) এর কনিষ্ঠ পুত্র হযরত ইসাহাক (আ.) এর প্রতিও আল্লাহ্ তাআলার সেই আশিস বর্ষিত হয় এবং ইসাহাক (আ.) এর বংশে হযরত ঈসা (আ.) পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বহু নবী রসূলের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু তাঁদের আগমন ছিল বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ, সমগ্র বিশ্বমানবের জন্য ছিল না। অতঃপর মহান আল্লাহ্ তাআলা ইসাহাক (আ.) এর বংশে নবুওয়তের দরজা রুদ্ধ করে দিয়ে ইসমাঈল (আ.) এর বংশে সমগ্র বিশ্ব মানবের জন্য বিশ্বনবী রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে পরিপূর্ণ বিধান দাতা নবী রূপে আবির্ভূত করে হযরত ইসমাঈল (আ.) এর বংশে নবী রসূলের আবির্ভাব ঘটান। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) পরিপূর্ণ বিধানদাতা নবী হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু পাপের স্রোত বন্ধ হয়ে যায়নি তাই করুণাময় আল্লাহ্ তাআলা বান্দার প্রতি করুনার দিনর্শন রূপে মহানবী (সা.) কে অনুকরণ ও অনুসরণ করে সংস্কারক হিসাবে উম্মতি নবীর আগমনের পথ খোলা রেখেছেন। দৈনন্দিন দরূদ শরীফে আমরা আল্লাহ্ তাআলার নিকট এই আশিসই কামনা করে থাকি। হযরত রসূল করীম (সা.) এর আগমনে জাতিয় ভিত্তিতে অর্থাৎ ইহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও অন্যান্য সকল জাতির মধ্যে পৃথকভাবে নবী রসূল আগমনের পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে গেছে। আর কোন জাতির মধ্যে নবী রসূলের আবির্ভাব হবে না। এখন একমাত্র ইসলামেই উম্মতি নবুওয়তের প্রবেশ পথে হযরত ইমাম মাহদী (আ.) আবির্ভূত হয়েছেন। ইসলাম ব্যতীত আর কোন ধর্মে সংস্কারের এ ধারা নেই।

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "আল্লাহ্ ফেরেশ্‌তা ও মানুষের মধ্য থেকে রসূলগণ মনোনীত করেন। আল্লাহ্ শুনেন এবং সব জানেন" (সুরা হজ্জ) "উহা ব্যতীত আল্লাহ্ নশ্বর মানবের সাথে কথা বলেন না, অথবা পর্দার আড়াল থেকে অথবা তিনি রসূল প্রেরণ

করেন। নিশ্চয়ই তিনি মহান ও মহাজ্ঞানী।" (সূরা আস শুরা) "তিনি গুপ্ত তত্ত্বের অধিকারী। তিনি যাকে নবী বলে মনোনীত করেন তদ্ব্যতীত অন্য কারো নিকট ইহা প্রকাশ করেন না" (সূরা জ্বিন) হে আদম সন্তানগণ! যখন তোমাদেরই মধ্য থেকে তোমাদের জন্য কোন নবী আসেন এবং তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তখন তোমরা তার অনুসরণ করো। যারা পরহেজগারী অবলম্বন করবে এবং নিজেকে সংশোধন করে নেবে তাদের জন্য চিন্তা ও ভয়ের কোন কারণ নাই।" (সূরা আ'রাফ)

আদম সন্তানগণ শয়তানের অবিরাম আক্রমণ থেকে যাতে রক্ষা পেতে পারে দুনিয়াতে ভয় এবং আখেরাতে চিন্তার যে সম্ভাবনা ছিল, দয়াময় আল্লাহ্ তাআলা তাঁর এই অঙ্গীকারের মাধ্যমে তা দূর করে দিয়েছেন।

হযরত রসূল করীম (সা.) দরূদের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বেশি বেশি দরূদ পাঠ করার জন্য তাঁর উম্মতের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। দরূদের মমার্থ এটাই যে, হে আল্লাহ্ তাআলা! তুমি ইবরাহীম (আ.)-এর বংশে যেরূপ নবী রসূল প্রেরণ করেছ, তদ্রূপভাবে আমাদের মধ্যেও নবী প্রেরণ কর, যিনি আমাদেরকে কিতাব ও জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা শিখাবেন এবং পবিত্র করবেন।

ইসলাম বিশ্বজনীন প্রচার মূলক ধর্ম। প্রচার কার্যের দ্বারা অমুসলমানকে মুসলমান বানানো ছিল মুসলমান জাতির বিশেষ করে নায়েবে রসূলের দাবীদারগণের ঈমানী দায়িত্ব। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "তোমাদের মধ্যে এমন এক দল লোক থাকা চাই যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎ কাজের নির্দেশ দিবে এবং অসৎ কাজের নিষেধ করবে; এরাই সফলকাম।" "তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নির্দেশ আসার পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে ও নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। তাদের জন্য মহা শাস্তি রয়েছে" (আলে ইমরান)।

একটি দল থাকতে হলে অবশ্যই একজন নেতা এবং একটি কেন্দ্র থাকতে হবে, যার মাধ্যমে একতা শৃংখলা বজায় রেখে সুষ্ঠুভাবে ইসলামের প্রচার কার্য চলবে। প্রশ্ন এই যে, বর্তমানে সেই একটি দল কারা, যাদের একজন নেতা আছে, একটি কেন্দ্র আছে, যার মাধ্যমে সংঘবদ্ধ ভাবে একতা শৃঙ্খলা বজায় রেখে সুষ্ঠু ভাবে বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজে মত্ত? উত্তর হবে একমাত্র আখেরী জামানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দাবীকারক হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া জামা'ত ব্যতীত আর কেউ নয়।

আল্লাহ্ তাআলা বলছেন, "হে ঈমানদারগণ! যারা ঈমান এনেছ। আমি কি তোমাদেরকে এমন এক লাভজনক বাণিজ্যের সন্ধান দিব যা তোমাদেরকে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করবে? এটা এই যে, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ওপর ঈমান আন এবং নিজেদের ধন-সম্পদ এবং জীবন দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ কর। ইহাই তোমাদের জন্য কল্যাণজনক যদি তোমরা জ্ঞান রাখ।" (সূরা আস সাফ)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যগণ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দিয়ে নিজেদের ধন সম্পদ জীবন সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্র রাস্তায় কুরবানী বা উৎসর্গ করে বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে নিষ্ঠার সাথে অহর্নিশি জিহাদে লিপ্ত আছে। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রচারকদের কুরবানী বা ত্যাগের ফলেই ত্রিত্ববাদী খ্রীষ্টানগণ আজ ইসলামের শান্তির সুশীতল ছায়াতলে এসে তাদের জীবনকে ধন্য মনে করছে।

জিহাদের কথা শুনলেই যারা ঢাল তলোয়ার চালানোর কথা মনে করেন, তারা অন্ধের হাতি দেখার ন্যায় হাতড়িয়ে মরছে। এ কথাটি ভাল করে জেনে রাখা উচিত যে, তরবারীর জিহাদের সময় চলে গেছে। বর্তমানে অসত্যের সাথে কলেমার জিহাদ, যুক্তি প্রমাণাদি দ্বারা নিদর্শন প্রদর্শন ব্যতিরেকে অন্য কোন জিহাদ নেই। যারা ধারণা করে যে, প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আ.) আগমন করে তলোয়ার দ্বারা কাফেরদেরকে নিধন করে রক্তপাত ঘটাবেন এটা আদৌ সঠিক নয়। যারা এইরূপ আশা আকাঙ্ক্ষা করে তারা আল্লাহ্ ও রসূল করীম (সা.)-এর আদেশ নির্দেশকে অমান্য করে। "সেই ব্যক্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, যে যুক্তি প্রমাণ দ্বারা ধ্বংস হয়েছে এবং সেই ব্যক্তি যেন জীবিত হয়, যে যুক্তি প্রমাণ দ্বারা জীবন লাভ করেছে"। (সূরা আনফাল) ঢাল তলোয়ারের যুগ গত হয়ে গেছে। এখন যুক্তি প্রমাণের যুগ। বর্তমান যুগে ধর্মের জন্য কেউ যুদ্ধ করে না। যুদ্ধ করে ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে মসনদ লাভের জন্য।

সে যা হোক, রসূল করীম (সা.) এর আদর্শ ও তাঁর শিক্ষাকে ভুলে যাওয়ার কারণেই আজ মুসলমান জাতির চরম অধঃপতন। এই অবস্থায় করুণাময় আল্লাহ্ তাআলা সঠিক সময়ে আখেরী জামানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে আবির্ভূত করে পুণরায় রসূল করীম (সা.) এর আদর্শ শিক্ষার পথ খুলে দিয়েছেন। ফলে ততদিন পর্যন্ত শান্তি আসতে পারে না যতক্ষণ না মুসলমান জাতি আল্লাহ্র প্রত্যাদিষ্ট সেই মহাপুরুষকে মেনে নিচ্ছে। আল্লাহ্ করুন, শীঘ্র তারা তাঁকে (আ.) মেনে নিন আর শান্তির ছায়ায় আশ্রয় নিন।

নেযামে নও
(নব বিশ্বব্যবস্থা)

হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ রাযিআল্লাহু আনহু,
নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর ২য় খলীফা

(৩য় কিস্তি)

(পাক্ষিক আহমদী ৩০ জুন ২০০৮ সংখ্যার ধারাবাহিকতায়)

বলশেভিজমের অর্থনৈতিক ছয় নীতি এবং এর ফল:

'*বলশেভিজম*' এর মূলনীতিগুলো সম্পর্কে আমি এখন বলছি। তবে মনে রাখতে হবে, বলশেভিজমের সেই মূলনীতিগুলো প্রচলনে অর্থনৈতিক যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশী ভূমিকা রেখেছে, তা হলো ধনী ও গরীবের মধ্যকার বৈষম্য কী ভাবে দূর করা যায়। রোগাক্রান্ত হলে ধনী এক ব্যক্তি যেভাবে ঔষধ পথ্যাদি পেয়ে যায় তেমনি গরীবও যেন তার চিকিৎসায় ঔষধ পায়। ধনাঢ্যরা যেমন পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করে অনুরূপ গরীবেরও যেন পরনের কাপড় মিলে। বিত্তবানরা যেমন পেট ভরে খায়, প্রত্যেক গরীবও যেন তেমনি পেট পুরে খেতে পায়, কেউ-ই যেন ক্ষুধার্ত থেকে না যায়।

এমন বঞ্চনা যেন কমে আসে আর আর্থিক দিক থেকে গরীবদের যে সঙ্কট দেখা দিয়ে থাকে সে সবের সুরাহা যেন হয়।

এ উদ্দেশ্যে বলশেভিজম অর্থনৈতিক যে পদ্ধতি নির্ধারণ করেছে তা মার্ক্সীয় নীতি অনুযায়ী নিম্নরূপ:

> *মনে রাখতে হবে, অর্থনৈতিক সেই মূলনীতিগুলো প্রচলনে সবচেয়ে বেশী ভূমিকা রেখেছে যা, তা হলো ধনী ও গরীবের মধ্যকার বৈষম্য কী ভাবে দূর করা যায়। রোগাক্রান্ত হলে এক ধনী ব্যক্তি যেভাবে ঔষধ পথ্যাদি পেয়ে যায় তেমনি গরীবও যেন তার চিকিৎসায় ঔষধ পায়। ধনাঢ্যরা যেমন পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করে অনুরূপ গরীবেরও যেন পরনের কাপড় মিলে। ধনাঢ্যরা যেমন পেট ভরে খায়, প্রত্যেক গরীবও যেন তেমনি পেট পুরে খেতে পায়, কেউ-ই যেন ক্ষুধার্ত থেকে না যায়।*

<u>প্রথম নীতি:</u>

যার যতটা কর্মক্ষমতা আছে তার পুরোটাই তার থেকে আদায় করে নেয়া হবে।

ধরা যাক, এক ব্যক্তির জমির পরিমাণ ১০ একর আর অপর এক ব্যক্তির জমি হলো ১০০ একর। সেক্ষেত্রে তারা এমন করবে না যে ১০ একর জমির মালিক থেকে কিছু অর্থ আদায় করে নিবে আর ১০০ একরের মালিক থেকেও অনুরূপভাবে কিছু পরিমান টাকা আদায় করে নিবে। বরং তারা এটা দেখবে যে ১০ একরের মালিকের প্রয়োজন কতটা আর ১০০ একরের মালিকের প্রয়োজনই বা কত। এভাবে ব্যক্তির প্রয়োজন মিটিয়ে দিয়ে অতিরিক্তটা রাষ্ট্রের করায়ত্ত হবে। যেমন–তারা দেখবে ১০ একর জমির মালিকের নিজ স্ত্রী ও সন্তানদের ভরন-পোষণ চালিয়ে নিজের জীবিকা নির্বাহ করে গৃহপালিত পশুদের প্রতিপালন করার জন্য যতটা প্রয়োজন ততটা তাকে দিয়ে বাকিটা, সরকার বলবে এটা তোমাদের নয় বরং এটা আমাদের (রাষ্ট্রের)। এভাবে হাজার একর জমির মালিকেরও প্রয়োজন কতটা শুধু তাই বিবেচ্য হবে আর উদ্বৃত্ত সম্পদ রাষ্ট্র নিজ করায়ত্বে নিয়ে নিবে, কেননা তারা বলে, আমাদের নীতি হলো– কারো কাছে উদ্ধৃত্ত যা-ই আছে তা নিয়ে নাও।

<u>দ্বিতীয় নীতি:</u>

দ্বিতীয় নীতি তারা এটা নির্ধারণ করেছে যে, কারো প্রয়োজন যতটা, সেই পরিমাণই তাকে দেয়া হোক। যেমনটা প্রথম নীতি অনুযায়ী– শত বা হাজার একর জমির মালিক থেকে উদ্বৃত্ত আয় নিয়ে নেয়া হয় আর একই নীতি অনুযায়ী চাহিদা যতটুকু ততটুকু তাকে দেয়াও হয়।

ধরা যাক, হাজার একর জমির মালিক

থেকে রাষ্ট্র পাঁচ হাজার টাকা আদায় করেছে কিন্তু তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৩ জন। সে ক্ষেত্রে তাকে বেশি পরিমাণ টাকা দেয়া হবে না বরং সদস্য সংখ্যা অনুযায়ী দেয়া হবে। কেননা, যেই নীতির আওতায় তার কাছ থেকে সম্পদ নেয়া হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে– যার যতটা আছে সবটা নিয়ে নাও, আর দাও ততটুকু যতটুকু তার প্রয়োজন। তাকে বলা হবে যেহেতু তোমার কাছে পরিমাণে বেশি ছিলো তাই বাড়তিটা নিয়ে নেয়া হয়েছে আর তোমার প্রয়োজন যতটুকু রয়েছে ততটুকুই তোমাকে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ দেয়ার ক্ষেত্রে তুমি কম-ই পাবে।

তৃতীয় নীতি:

তৃতীয় নীতি তারা এটা নির্ধারণ করেছে যে, জনগণের অতিরিক্ত উৎপাদনের ওপর সরকার অধিকার রাখে, তাই জনগণের কল্যানার্থে রাষ্ট্র তা ব্যয় করবে।

ধরা যাক, দুজন জমির মালিক আর দুজনেরই ১০ একর করে জমি আছে। তাদের মধ্য থেকে একজন কঠোর পরিশ্রম করে ফসল ফলালো আর তার প্রতি একরে ৩০ মণ শস্য উৎপন্ন হলো, কিন্তু অপর জন প্রতি একরে মাত্র ৩ মণ করে শস্য ফলালো। অর্থাৎ একজন ফলালো মোট ৩০০ মণ আর অপর জন ফলালো মাত্র ৩০ মণ। এবারে দেখ! যে ৩০০ মণ ফলালো তার প্রয়োজন মেটাতে সরকার তাকে মাত্র ৪০ মন শস্য দিল আর বললো এথেকে তোমার প্রয়োজন পুরা করো। কেননা তোমার উৎপাদন যদিও বেশি হয়েছে কিন্তু তোমার প্রয়োজন মেটানোর জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। অতিরিক্ত ২৬০ মন আমাদের করায়ত্বে দিয়ে দাও। এভাবে অপরজন, যে মাত্র ৩০ মণ শস্য ফলিয়েছে তার জন্য তার নিজের প্রয়োজন পুরা করতে যদি মাত্র ১০ মনেরই প্রয়োজন থাকে তাহলে সরকার বলবে এই ১০ মণ রেখে অবশিষ্ট ২০ মণ আমাদেরকে দিয়ে দাও। অতএব তৃতীয় নীতি হচ্ছে এই, প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদন হলে পরিশ্রম করেই ফসল ফলাও বা দৈবক্রমেই অতিরিক্ত উৎপাদন হোক না কেন তা তারা নিয়ে নিবে কেননা ঐ উৎপাদনের ওপর সরকারেরই অধিকার আছে, তোমাদের নয়।

চতুর্থ নীতি:

সরকারের নিয়ন্ত্রণ, জনগণের অধিকার সংরক্ষন করতে নয় বরং তাদের সম্পদ এবং তাদের অধিকারভুক্ত জিনিস পত্রের ওপর সরকারী কর্তৃত্ব কার্যকর করার জন্য হবে। উৎপাদনের অতিরিক্তটা নিয়ে নেয়া হবে, শুধু মাত্র এতটুকু আইন-ই যথেষ্ট হবে না কারণ এতে করে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ কেবল মাত্র ব্যক্তি পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকে। তাই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ পুরো ভূখন্ডের ওপরই হওয়া উচিত। এজন্য কোন এলাকায় যদি আখ ভালো জন্মায় সে ক্ষেত্রে তাদের নীতি হলো, রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধিকার থাকবে যে তারা জনগণকে নির্দেশ দিবে সেই এলাকায় কেবল আখেরই চাষ করতে হবে। আবার কোন এলাকায় গম খুবই ভালো হয়। সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ক্ষমতার আওতাধিন থাকবে যে ঐ এলাকায় কেবল গম চাষেরই নির্দেশ দেয়া হবে, আর গম ছাড়া অন্য কোন ফসলের চাষ ঐ জমিতে কেউ করতে পারবে না। আর কোন এলাকায় তুলার ফলন বা কোন এলাকায় যবের ফলন ভাল হলে, সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রই নির্ধারণ করে দিবে কোন্ জমিতে কী ফসল উৎপাদন করতে হবে। অর্থাৎ সকল জনগণ এই নির্দেশ কার্যকর করতে বাধ্য থাকবে। কোন্ জমিতে তারা কোন নির্ধারিত ফসল ফলাবে–তা রাষ্ট্রই ঠিক করবে, কেউই ফসল উৎপাদনের এই নির্ধারণ অমান্য করতে পারবে না। অতএব ৪র্থ নীতি অনুযায়ী ফসল উৎপাদনের বন্টন নীতিমালা তারাই নির্ধারণ করবে অর্থাৎ কোন কোন এলাকায় কি কি ফসল চাষ হবে তা আমরাই (রাষ্ট্র) নির্ধারণ করবো আর জনগণের ওপর এটা বাধ্যতামূলক হবে যে তারা নির্দেশিত ফসল'ই ফলাবে।

পঞ্চম নীতি:

পঞ্চম নীতি হলো–বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতা স্ব-হস্তে কাজ করার মোকাবেলায় কোন মূল্য রাখে না। তাদের মতে এটা বলা যে, অমুক ব্যক্তি জ্ঞানমূলক কোন বিষয় নিয়ে ভাবছে এটা সম্পূর্ণ রূপে অযথা এক কর্ম । প্রকৃত কর্ম হলো স্ব-হস্তে কাজ করে উৎপাদন করা। তাই বুদ্ধিজীবিদেরও স্ব-হস্তে উৎপাদনের কাজ করতে হবে। তারা যদি নিজ হাতে কাজ না করে তবে তারা না খেয়ে মরুকগে আমরা তাদের সাহায্য করতে পারি না।

ষষ্ঠ নীতি:

ষষ্ঠ নীতি তারা এটা নির্ধারণ করেছে যে, নিজেদের নিয়মনীতি কার্যকর করতে সর্বদা আক্রমণাত্মক ও চড়াও হওয়ার নীতি অবলম্বন করা হবে। এটা আমাদের নীতি নয় যে তাদের রক্ষা করতে ছাড় দেয়া হবে বরং নিজ নীতি

কার্যকর করতে অন্যের ওপর হামলা করতে হবে।

প্রথম নীতির ফল–সকল পুঁজিপতিদের সম্পদ নিজেদের দখলে নেয়াঃ

বলশেভিজমের অর্থনৈতিক প্রথম নীতির পরিনামে সকল সম্পদশালীদের সম্পত্তি সরকার করায়ত্ত করে নেবে। কেননা তারা সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছে যে সম্পদ যা কিছু পাওয়া যায় পুরোটা নিয়ে নাও- চাষের জমি নাও, শিল্প কারখানা নাও, শিল্পের কাঁচামাল নাও আর এভাবে যার কাছেই যা কিছু আছে জোর পূর্বক হলেও নিজের করায়ত্তে নিয়ে নাও।

দ্বিতীয় নীতির ফল- স্বহস্তে কর্ম সম্পাদনকারীদেরকে তাদের প্রয়োজন অনুসারে সরঞ্জামাদি যোগান দেয়াঃ

বলশেভিজমের ২য় নীতি অনুযায়ী সরকার নিজ হাতে কর্ম সম্পাদনকারী শ্রমিকদের তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সরঞ্জামাদির যোগান দেয়ার দায়ীত্ব নেয়। যেমন এক পরিবারে পাঁচজন সদস্য আছে তারা তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিবে যে এই পাঁচজন সদস্যের জন্য এতটা পরিমাণ কাপড় দেয়া যায়, এতটুকু পরিমাণ খাদ্য দেয়া যায়, এই পরিমাণ জ্বালানি দেয়া যায়, অনুরূপভাবে চিকিৎসক নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে যারা অসুখ বিসুখে বিনে পয়সায় তাদের চিকিৎসা দিবে অর্থাৎ এই ভাবে অন্যান্য সব ব্যবস্থাগুলি নেয়া হবে। এভাবে পরিধানের পোষাক, খাবার জন্য খাদ্য শস্য, রোগ ব্যাধিতে চিকিৎসার ঔষধ এই সব যোগান দেয়ার দায়ীত্ব থাকবে সরকারের। অর্থাৎ সরকার সকল ব্যক্তির যে পরিমাণ প্রয়োজন তার তালিকা প্রণয়ন করে তা পুরা করে দেবে। এখন যদি গভীর ভাবে বিষয়টির ওপর চিন্তা ভাবনা করা যায় তবে এটাই পরিলক্ষিত হয় যে বলশেভিজম অত্যাবশ্যকীয় ঐ মৌলিক চাহিদাগুলো পুরা করে দিয়েছে আর এ পদ্ধতিতে কাজ করা হলে কোন ভুঁখা বা নাঙ্গা দৃষ্টিগোচর হবে না। শুধু তারা ব্যতীত যারা কোন ধর্মকর্মের দায়ীত্বে থাকে। যেমন পাদ্রী , পুরোহিতগণ। কেননা তাদের দৃষ্টিতে স্ব-হস্তে কাজ না করে সম্পূর্ণ রূপে বুদ্ধিবৃত্তিক কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ কোনই কাজের লোক নন। অতএব সেই পাদ্রী পুরোহিতের ন্যায় অন্যান্য ধর্মের ব্যক্তিগণ এবং জ্ঞানবিশারদ দার্শনিকগণকেও তারা অকর্মণ্য মনে করে আর বলে যে তাদের স্ব-হস্তে কোন না কোন কাজ করা উচিত নতুবা তারা না খেয়ে থাকলে রাষ্ট্রের কোন দায় দায়ীত্ব নেই।

তৃতীয় নীতির ফল– সরকারের বন্টনকৃত সম্পদের

অতিরিক্ত যে সম্পদ ব্যক্তি বিশেষের কাছে থাকবে তা রাষ্ট্রের প্রাপ্য হবে

তৃতীয় নীতি অনুযায়ী তারা ভূ-স্বামী এবং ব্যবসায়ীগণ সহ অন্যান্য নাগরিকদেরকে নির্ধারিত পরিমাণ সম্পদ বন্টন করে দেয়ার পর অতিরিক্ত যে সম্পদ তাদের থাকবে তা সরকার নিয়ে নিবে। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি নিজ জমিতে ৫০ মণ আখ উৎপন্ন করলে তার প্রয়োজন পুরা করার জন্য ২০ মণই যদি যথেষ্ট হয় তবে বাড়তি ৩০ মণ আখ সরকার নিয়ে নিবে আর বলবে যে তোমার উৎপাদিত এই বেশি পরিমাণ যেহেতু তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত এ জন্য এটা সরকারের অধিকারভুক্ত সম্পদ। অনুরূপ ভাবে, কোন ব্যক্তির বিশাল জমি আছে কিন্তু অল্প পরিমাণ জমি থেকেই তার জীবিকা নির্বাহ হতে পারে। তাই যতটুকু জমি থাকলে তার জীবিকা নির্বাহ হয় ততটুকু তাকে দিয়ে বাকীটা রাষ্ট্র নিজ অধিকারে নিয়ে নিবে।

চতুর্থ নীতির ফল–পেশা নির্বাচনের স্বাধীনতা হরণ

বলশেভিজমের ৪র্থ নীতি কার্যকর করার পরিণামে ভূমির মালিকদের, ব্যবসায়ীদের এবং অন্যান্য পেশাজীবিদের পেশা নির্বাচনের স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে। আর সরকারের ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যবসা বানিজ্যও চলবে। ব্যক্তি বিশেষের পেশা, যেমন- ব্যবসা, কৃষিকাজ আর শিল্প কারখানার কাজের ধরণ নির্ধারনের অধিকার শুধু মাত্র রাষ্ট্রেরই থাকবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, জমি চাষের ক্ষেত্রে অমুক একশত মাইল এলাকা জুড়ে কেবল গমের চাষ করা হবে, অমুক এলাকায় শুধুই আখ আর অমুক এলাকায় কার্পাশ তুলার চাষ হবে, সরকারই এটা নির্ধারণ করবে। আমাদের দেশে তো জমির মালিকেরা দুই বার করে ফসল ফলায়। প্রথম দুইবার কার্পাশ তুলার চাষ করলে পরের দুইবারে আখ ফলায়। আর তারা বলে, ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা আছে আখ চাষ করলে তারা তা খেতে পাবে। ক্ষুদ্র চাষীরা এরূপ না করলেও যাদের কাছে ১০/১২ বিঘা জমি আছে তারা অবশ্যই এরূপ করে। কিন্তু বলশেভিজমে সরকার এলাকা ভিত্তিতে নির্ধারণ করে দেয় যে, এবারে গম, পরের বারে আখ এভাবে কোন কোন

জেলায় শুধুই গম চাষ করা হোক। আবার কোন কোন জেলায় শুধুই আখ আবার কোন জেলায় এমন যে সেখানে শুধুই কার্পাশ তুলার চাষ করা হোক। কেননা তারা বলে অমুক এলাকা অমুক ফসল উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত, এ জন্য আমরা নির্দেশ দিচ্ছি যে সেই এলাকায় নির্ধারিত মৌসুমে নির্ধারিত ফসল ছাড়া অন্য ফসল যেন ফলানো না হয়। কেউ যদি আপত্তি করে যে, আমি অমুক খাদ্যশষ্য (গম বা ভূট্টা) কি করে পাব? তবে তারা বলে দেয় যে, রুটি-কাপড় আমরা দিব সে ব্যাপারে তোমাদের ভাবনা কী! তোমাদের সেই ফসলই ফলাতে হবে আমরা যা ফলানোর জন্য নির্দেশ দিয়েছি । এভাবে বলশেভিজমের নীতিতে কৃষি জমির মালিকদের অবস্থান এক কৃষি শ্রমিকের অবস্থানে পরিণত হবে।

পঞ্চম নীতির ফল-ধর্মীয় ব্যবস্থাপনায় দখলদারিত্ব

বলশেভিজমের ৫ম নীতি অনুযায়ী তারা ধর্মীয় ব্যবস্থার মধ্যে দখলদারিত্ব চালায় এই বলে যে, পাদ্রী পুরোহিতরা স্ব-হস্তে কাজ না করার কারনে তারা খাদ্য পাবার অধিকারী নয়। তারা বলে যেহেতু পাদ্রীরা স্ব-হস্তে কোন রূপ কাজ কর্মই করেনা। অতএব, তারা নিষ্কর্মা আর এমন নিষ্কর্মা লোকদের রুটি রোজগার দেয়া যায় না। এজন্য তারা পাদ্রীদেরকে কাজ করতে বাধ্য করে। ফলে পাদ্রীরাও খুবই সামান্য সময় ইবাদতে কাটাতে পারে আর অধিকাংশ সময়ই কোন না কোন কায়িক শ্রমের কাজে ব্যয় করে।

নাস্তিকতা সৃষ্টিকারী এক প্রচেষ্টা!

ধর্মের সাথে বৈরীতায় তারা নতুন এক পন্থা উদ্ভাবন করেছে। ধর্মের বিষয়ে তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, ধর্মপালন ব্যক্তি স্বাধীনতার বিষয় হওয়া উচিত। পিতা মাতা বা অভিভাবকদের নিজ সন্তানদের শৈশব কালে ধর্মীয় শিক্ষা দানের কোন অধিকার থাকবে না। শিক্ষা দান সম্পূর্ণ ভাবে সরকারের হাতে থাকা উচিত। তারা বলে, দেখ! শিশুদের ওপর কেমন নির্যাতন করা হয়ে থাকে। শৈশব কালেই তাদের অন্তরে ধর্মের প্রভাব ঢুকিয়ে দেয়া হয়। ফলে, যারা মুসলমান তাদের সন্তানরা মুসলমানই হয়, হিন্দু যারা তাদের সন্তানেরা হিন্দু হয়ে থাকে। আর যারা অগ্নিউপাসক তাদের সন্তানেরা অগ্নিউপাসকই থেকে যায়। এমনটি হওয়া অবশ্যই উচিত নয় বরং শিশুদের সর্ব প্রকার ধর্মীয় প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা উচিত। শিশুরা প্রাপ্ত বয়স্ক হলে তাদের যা মর্জি ধর্ম পালন করবে। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পূর্বেই তাদের অন্তরে বলপূর্বক ধর্মীয় প্রভাব ঢুকিয়ে দেয়াটা সুস্পষ্ট এক নির্যাতন । অতএব এই নীতির ফলে ধর্মকে বিষ সদৃশ নির্ধারণ করা হয়। তারা (সরকার) ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের তাদের মা বাপ থেকে পৃথক করে নিজেদের আওতায় নিয়ে নেয় আর তাদের স্কুলে শিক্ষা দিতে থাকে। যেখানে তাদের কানে ধর্মের নাম পর্যন্ত পৌঁছায় না। তারা ১৮/২০ বছর বয়সে পৌঁছানোর পর যখন তারা পুরোপুরি নাস্তিকে পরিণত হয় তখন বলা হয়, এবার এরা প্রাপ্ত বয়স্ক হয়েছে এখন এদের বুঝবার ক্ষমতা হয়েছে এখন এরা যা চায় ধর্ম অবলম্বন করুক। বাস্তবতা হলো ঐ সময়ে তারা কী বুঝবে। তখন তো নাস্তিকতা তাদের প্রতিটি শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হয়ে চলছে।

অবশ্য তারা বলে, আমরা শিশুদের ওপর জোর জবরদস্তি করিনা, বরং তাদের অন্তর পরিস্কার রাখি যাতে পরবর্তিতে তাদের ওপর যে কোন ছাপ অঙ্কিত করা যায়। যদিও অন্তর এইরূপ সম্পূর্ণ স্বচ্ছ রাখার অর্থ নাস্তিকতা ভিন্ন অন্য কিছু নয়। ১৮-২০ বছর ধরে তাদের নিজেদের উদ্দেশ্যমূলক কথা বার্তা ওদের কানে অনবরত ঢুকিয়ে দিতে থাকে পরে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর তাদের এই কথা বলা যে, আমরা তাদের হৃদয় পুরো-পুরি স্বচ্ছ রেখে দিয়েছি এটি সরাসরি এক মিথ্যাচার বৈ কিছু নয়। সত্য এটাই যে, এভাবে তারা হৃদয়কে স্বচ্ছ রাখে না বরং তাদেরকে নাস্তিকতার গহ্বরে ফেলে দেয়। অতএব এই নীতি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সম্পূর্ণ নাস্তিক বানিয়ে ছাড়ে।

ষষ্ঠ নীতির ফল–বহির্দেশে নিজেদের মতবাদ প্রসারে আগ্রাসী প্রচারণা:

৬ষ্ঠ নীতি অনুযায়ী তারা অন্যান্য দেশে ঢুকতে, নিজেদের মতাদর্শ বিস্তার করতে অনুপ্রবেশকারী পাঠাতে শুরু করে। এমন কি তারা নিজেদের নীতি কার্যকর করতে সর্বদাই আগ্রাসী হামলা পরিচালনার পন্থা অবলম্বন করতে চায়। কখনই ক্ষমা করতে চায় না, এজন্যই তারা জার্মানী জাপান ও ইতালি ইত্যাদি দেশে নিজেদের এজেন্ট পাঠাতে শুরু করে দেয় আর এরাই বিদেশে কমিউনিষ্ট পার্টি নামে আখ্যায়িত। পাঞ্জাবেও কমিউনিষ্টদের দেখা যায়। ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও যেমন বিহার ইত্যাদিতেও এরা আছে। এভাবে বনিইসরাইল জাতির রাজনৈতিক অভিভাবক মার্ক্সীয় নীতির

অনুসারীরা রাশিয়ায় সরকারী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে যায়। আর এভাবে সেই বিপ্লব কার্যকর রূপ নেয়। এর ফলে প্রত্যেকেরই রুটি ও কাপড় মিলবে, দারিদ্র দূর হবে আর ধনী গরীবের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। এটা এতই ব্যাপকতা লাভ করলো যে ধীরে ধীরে পৃথিবী জুড়ে এর প্রভাব পড়তে শুরু করলো, একারনে আরও এক ফল দৃশ্যমান হয়ে উঠলো।

বলশেভিজমের প্রতিক্রিয়ায় ইউরোপে তিনটি বিপ্লব–ফ্যাসিজম, নাৎসীজম, আর ফ্যালানজিষ্টদের উত্থান

এই উত্থান এভাবে ঘটলো যে, বলশেভিজমের এজেন্টরা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লো আর অন্যান্য সব দেশকেও তারা এই বিপ্লবের আওতায় আনতে শুরু করলো।

তখন ইউরোপের কতিপয় দেশ–জার্মানি, ইতালি ও স্পেন, যারা এই স্বপ্নে বিভোর ছিলো যে বর্তমান বিশ্বের শক্তিশালী রাষ্ট্রের ক্ষমতাধর সরকার হিসেবে তারা অচিরেই সারা দুনিয়ার রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ নিজেদের অধিকারে নিয়ে নিবে। ফলে এরা বলশেভিজমের ঐ বিপ্লবের মধ্যে নিজেদের স্বপ্ন ভাঙ্গার আশঙ্কা দেখতে পেল। এই দেশগুলো ভাবলো যে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও আমেরিকা দীর্ঘ দিন বিশ্বজুড়ে শাসন চালিয়েছে আর এক দীর্ঘ সময় শাসন চালানোর পর এখন তাদের মধ্যে শৈথিল্য সৃষ্টি হয়েছে আর এই সরকারগুলো দূর্বল হয়ে পড়েছে, পৃথিবী শাসন করার অধিকার এখন আমাদের। অতএব জার্মানি, ইতালি ও স্পেন বাসীরা, যারা এই স্বপ্ন দেখছিলো যে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকার রাজত্ব এখন শৈথিল্য ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে, তাদের স্থলে এখন আমাদের সুযোগ পাওয়া উচিত, যাতে আমরাও রাজত্ব করার স্বাদ পাই। ফলে সেসব দেশে যখন এই আন্দোলন পৌঁছালো তখন তারা খুবই ঘাবড়িয়ে গেল আর ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। সাধারণ এক শৃগাল বা নেকড়ে যেমন তরতাজা এক ষাঁড় দেখলে অপেক্ষা করতে থাকে যে ভোঁস-ভাঁষকারী এই ষাঁড় হাঁপিয়ে উঠার পর তার দম যখন ফুরিয়ে যাবে খুবই মজা করে তখন তা খেতে পাবে। বড় আশা নিয়ে এজন্য সে অপেক্ষারত থাকে। একই ভাবে জার্মান ও ইতালি বাসীরা অপেক্ষা করছিলো যে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকার শক্তি অচিরেই ভেঙ্গে পড়বে এবং আমরা বিশ্বের শাসন ক্ষমতা নিজেদের করায়ত্ত করে নিব। যেভাবে তারা এক দীর্ঘ সময় ধরে বিশ্বের সম্পদ থেকে নিজেরা উপকৃত হয়েছে একই ভাবে আমরাও তা আহরণ করে উন্নতি লাভ করবো। সে জন্য, বলশেভিজমের এই বিপ্লব তাদের মাঝে গভীর ভীতি সঞ্চার করলো যে, আমরা তো বলে থাকি ভবিষ্যতে আমাদের কর্তৃত্ব লাভ হবে, কিন্তু এই বিপ্লবতো বিদ্যমান সব রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে গ্রাস করতে চায়। ফলে এই বিপ্লব বিরোধী কর্মসূচী ঐ সব দেশে প্রণীত হলো, যেমন ইতালিতে মুসোলিনীর মাধ্যমে ফ্যাসিজমের উদ্ভব ঘটলো, জার্মানীতে ঐ বিপ্লব ঠেকাতে হিটলার নাৎসীজমের উদ্ভাবন ঘটালো আর স্পেনে সেনা শাসক জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে ফ্যালানজিষ্টদের আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো।

বলশেভিজম প্রতিরোধে উত্থিত নব আন্দোলনের উদ্দেশ্য:

উপরোক্ত তিনটি আন্দোলনের উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। আর তা হলো বলশেভিজমের বিপ্লব ঠেকানো। তারা ভাবলো, জনগণের মধ্যে বলশেভিজম-এর ঐ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়লে আমাদের নিজেদের উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা একেবারেই মাঠে মারা যাবে। যেহেতু সাধারণ জনগনের মধ্যে বলশেভিজমের বিপ্লব খুবই গ্রহণযোগ্য ছিলো এজন্য দরীদ্ররা এই বিপ্লবের পুরোধায় থাকতো। কেননা তারা বলতো এই আন্দোলনে আমাদের বস্ত্রের সংস্থান হবে, খাদ্য পাবো, চিকিৎসা মিলবে আর এভাবে আমাদের যাবতীয় প্রয়োজন মেটানো হবে। 'দূরবর্তী ঢাকে বাদ্যের তাল সর্বদা অনুরণন তোলে'। ভারতীয় উপমহাদেশেও কিছু লোক বলশেভিজম বিপ্লবের ধারক হয়ে দাড়িয়ে গেলো আর তারা মনে করলো যে, এই বিপ্লবী সরকারের কর্মকর্তা প্রত্যেক জনগণের কাছে আসবে আর সেলাই করা জামা পায়জামা দিবে, একই ভাবে খাওয়ার জন্য যে পরিমাণ খাদ্যশস্যের দরকার তা-ও দিবে। আর যে জিনিসেরই প্রয়োজন পড়বে সরকার সাথে সাথেই তা যোগাবে। তারা এটা জানে না যে, এই বিপ্লব কার্যকর হলে বিশ্বে বিদ্যমান সকল রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ভেঙ্গে দিয়ে প্রত্যেকের আহার ও বস্ত্রের ব্যবস্থা হবে বটে, তবে যা কিছু উদ্বৃত্ত থাকবে সরকার তা নিয়ে যাবে। তাই সাধারণ লোক এ বিষয়টি খতিয়ে দেখেনি, তারা কেবল এতটুকুই দেখেছে যে এই বিপ্লবের ফলে খাদ্য ও বস্ত্রের সংস্থান হবে আর কোন ব্যক্তি ভূঁখা বা নাঙ্গা থাকবে না। (চলবে)

ভাষান্তর : **মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্**

খিলাফত আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের মাধ্যম

এম আহমদ

খিলাফত আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের মহান মাধ্যম। আসলে খিলাফতের রজ্জু ছাড়া আধ্যাত্মিকতার চরম শিখরে পৌঁছা কোন মতেই সম্ভব নয়। কারণ যে জাতির কোন নেতা নেই সেই জাতি কিভাবে পারবে খোদার নৈকট্য অর্জন করতে? খোদার নৈকট্য অর্জন করতে হলে তো একতা আবশ্যক। আমরা রসূল করীম (সা.)-এর জীবনের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখতে পাব ইসলামের বিজয় আনতে একক নেতৃত্ব বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। একক নেতার প্রতি সাহাবাদের (রা.) প্রবল আনুগত্যই হাজার হাজার মুশরিকদের বিরুদ্ধে জয় লাভ করার অন্যতম কারণ ছিল। হযরত রসূল করীম (সা.)-এর মৃত্যুর পরও আমরা একক ইসলামী খলীফার নেতৃত্বে সমগ্র বিশ্ব পরিচালিত হতে দেখেছি। আর একক খলীফার আনুগত্যের ফলেই সাহাবীরা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ করতে পেরেছিলেন এবং আধ্যাত্মিকতার দিক থেকেও তাদের মান ছিল প্রথম শ্রেণীর। তাই নিঃসন্দেহ বলা যায়, কোন জাতি আধ্যাত্মিক উন্নতি করতে হলে খলীফার প্রয়োজন সর্বপ্রথম। খলীফার ছাড়া দোয়া করলে সেই দোয়া খোদার দরবারে গৃহীত হয় কম, খলীফা হল দোয়া কবুলিয়্যতের চাবি কাঠি।

খিলাফত আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের মাধ্যম। এ সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)- বলেন, "আমার মতে ইসলামে এই বিষয়টি একাংশের প্রাণ স্বরূপ। ধর্মের ব্যবহারিক দিক নানাভাবে বিভক্ত। ধর্মের যে অংশের সাথে এই বিষয়টির সম্বন্ধ, তা হলো জাতির একতা। কোন জামাত, কোন জাতি, ঐ পর্যন্ত উন্নতি করতে পারে না, যে পর্যন্ত একাকার রূপে তাতে ঐক্য পাওয়া না যায়। মুসলমানদের, জাতি হিসেবে তখনই পতন ঘটেছে যখন তাদের মধ্যে খিলাফত থাকে নাই। যখন খিলাফত থাকল না, তখন উন্নতিও বন্ধ হয়ে গেল। একতা ছাড়া উন্নতি হতে পারে না। উন্নতি একতা দ্বারাই সম্ভবপর। দুর্ভাগ্যক্রমে এই যুগে কোন কোন ব্যক্তি খিলাফতের সাথে মতভেদ করে। তাদের ধারণা খিলাফতের সম্বন্ধ রাষ্ট্রের সাথে। অথচ এখানে (সূরা নূর ঃ ৫৬) আল্লাহ তাআলা যত জোর দিয়েছেন ধর্মের উপরই দিয়েছেন। **"ওয়াদাল্লাহুল্লাযীনা আমানু মিনকুম"** (যারা তোমাদের মধ্যে ঈমান আনে) প্রথম বিষয় এটি, দ্বিতীয় **"ওয়া আমিলুস সালিহাতি"** (এবং পুণ্য কাজ করে) তৃতীয়, **"ওয়া লাইউমাক্কিনান্নালাহুম দীনাহুমুল্লাযীর তাযা লাহুম"** (তাদের জন্য নিশ্চয়ই তাদের ধর্ম দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করবেন)। চতুর্থ, **"ইয়া বুদুনানী লা ইয়ুশরিকুনা বি শাইয়া"** (তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকেও শরীক করবে না)। পঞ্চম, **"ওয়ামান কাফারা বা'দা যালিকা ফাউলাইকা হুমুলফাসিকুন"** (অতঃপর যারা অমর্যাদা করবে বা অকৃতজ্ঞ হবে তারাই সম্পর্কচ্যুত বিদ্রোহী)। এই পাঁচটি বিষয়েরই পরিষ্কার সম্বন্ধ রয়েছে ধর্মের সাথে। ধর্মীয় নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার সাথে শান্তির আগমন এটিই প্রকাশ করছে যে তদ্বারাও ধর্মীয় শান্তিই বুঝায়। এভাবে এই আয়াতের সর্বত্রই শুধু ধর্মের কথাই বর্ণিত হয়েছে। তারপর খোদা তাআলা বলেছেন, **"ওয়া আকিমুসসালাতা ওয়াতুযযাকাতা ওয়া আতিউর রসূলা লা আল্লাকুম তুরহামুন"** অর্থাৎ (সর্বাঙ্গীন সুন্দর জামা'ত) 'নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে, এবং রসুলের অনুবর্তিতা করবে, যাতে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়। এগুলো ধর্ম সংক্রান্ত আদেশ। সুতরাং এখানে শুধু ধর্মের কথাই বলা হয়েছে। নচেৎ যদি মনে করা হয় যে, রাষ্ট্রের কথা বর্ণিত হয়েছে। তবে প্রশ্ন উঠে আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় বর্ণনা প্রসঙ্গে রাষ্ট্রের কথা বলার সম্পর্ক কী? কাফেররাও তো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)- আরো বলেন, প্রকৃত সত্য কথা এটিই যে, খিলাফত রূহানী উন্নতির একটি মহান উপায়। এরই কথা এখানে বর্ণিত হয়েছে। রাষ্ট্র সম্বন্ধে নয়। এই

> ***কোন জামাত, কোন জাতি, ঐ পর্যন্ত উন্নতি করতে পারে না, যে পর্যন্ত একাকার রূপে তাতে ঐক্য পাওয়া না যায়। মুসলমানদের, জাতি হিসেবে তখনই পতন ঘটেছে যখন তাদের মধ্যে খিলাফত থাকে নাই। যখন খিলাফত থাকল না, তখন উন্নতিও বন্ধ হয়ে গেল। একতা ছাড়া উন্নতি হতে পারে না। উন্নতি একতা দ্বারাই সম্ভবপর।***

খেলাফতের অর্থ ‘মামুরিয়াত’ (প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তিদের খিলাফত) নেওয়া হউক বা প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্বমূলক ‘খিলাফত’ নেওয়া হউক, যে কোন অবস্থায় এখানে রুহানী খেলাফতের কথাই বর্ণিত হয়েছে। এই উভয় প্রকার খিলাফতই ‘রূহানী তরক্কীর’ উপায়। এই প্রকারে ‘মামুরিয়াতের খিলাফত’ একজন মানুষ খোদা হতে আলো পেয়ে অন্যদের আলোকিত করেন এবং প্রত্যাদিষ্ট মামুরদের প্রতিনিধিত্বমূলক খেলাফতের তত্ত্বাবধান ব্যবস্থার ফলে দুর্বলদেরও হেফাযত করা হয়।

সুতরাং, এই উভয় প্রকারের খিলাফতে আশীষ (বরকত) আছে। উভয়ই আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায়–এটি ছাড়া রূহানীয়াত লয় প্রাপ্ত হয়। দৃষ্টান্ত স্থলে দেখ, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর পর যখন খিলাফতের ব্যবস্থা ভঙ্গ হল, তখনই ইসলামের কোনই উন্নতি হয় নাই। কিন্তু রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পর যে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়ে ছিল, তাদের আমলে ইসলামের মহা পরিবর্তন সাধন হয়। বিভিন্ন জাতিসমূহ ইসলামে দাখেল হয়। ইসলাম মহাতেজে সর্বত্র প্রসার লাভ করে। কিন্তু যখন রূহানী খিলাফত থাকলো না, তখন থেকে ইসলামের উন্নতিও বন্ধ হয়ে গেল। রূহানী খিলাফত ছাড়া ইসলাম কখনো উন্নতি করতে পারে না, সর্বদা খলীফাদের মাধ্যমেই ইসলাম উন্নতি করেছে এবং ভবিষ্যতেও এর দ্বারাই উন্নতি করবে। সর্বদা খোদা তাআলাই খলীফা নিযুক্ত করে এসেছেন এবং ভবিষ্যতেও খোদা তাআলাই খলীফা নিযুক্ত করবেন”।

(তথ্য ঃ ১৯২১ সনের ২১ শে মার্চ প্রদত্ত সূরা নূরের খিলাফত সংক্রান্ত আয়াতের দারস হতে নেওয়া–পাক্ষিক আহমদী ৩০ শে জুন–১৯৬২ এর সৌজন্যে)।

ইসলামের চার খলীফার পরেই তো ইসলামী খিলাফত ধ্বংস হয়ে যায়। যখন ইসলামী খিলাফত থাকলো না তখন ইসলামের কি কোন উন্নতি হয়েছে? সবাই এক বাক্যে বলতে বাধ্য হবে যে যখন খিলাফত থাকলো না তখন ইসলামে প্রবেশ করেছে নানা অপশক্তি। ইসলাম যে মানুষকে খোদা পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে তাতে বাধা আসলো। ধীরে ধীরে মানুষ প্রকৃত খোদার ইবাদত করা থেকে বিরত হতে থাকলো। ইসলামের ওপর এক অন্ধকার যুগের প্রভাব পরল। চারদিকে এমন অন্ধকার যেখানে কোন আলো দেখা যাচ্ছে না, আলোর লেশমাত্রও নেই। এই অন্ধকার যুগকে আবার আলোতে রূপান্তরিত করলো উম্মতে মুহাম্মদীয়ার প্রতিশ্রুত মসীহ এবং তাঁরই খলীফাগণ। আর এই খিলাফতের মাধ্যমেই হাজার বছরের মৃত ব্যক্তিরা পুনরায় জীবন ফিরে পেলো। আজ খিলাফতের বরকতে আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছাও কোন কঠিন ব্যাপার নয় ।

কেউ যদি যাচাই করে দেখে আজ যারা খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থেকে জীবন পরিচালিত করছেন তারা আধ্যাত্মিক ভাবে এবং জাগতিক ভাবেও কতটুকু উন্নতি করছে আর যারা খিলাফত ছাড়া দিন কাটাচ্ছেন তারা কতটুকু আধ্যাত্মিক ও জাগতিক দিক দিয়ে উন্নতি করেছেন। মহান খোদা তাআলা আমাদের সবাইকে ঐশী খিলাফতের ছায়া দ্বারা সর্বদা আবৃত করে রাখুন, আমীন।

কবিতা–

খাতামান্নাবীঈন

মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন

সমগ্র বিশ্ব গগণ তলে
তাঁহারই উজ্জ্বল ক্বিরণ জ্বলে,
যিনি খাতামান্নাবীঈন মুহাম্মদ (সা.)
যখন আদম ছিল কাঁদা জলে।
জলধী জলে-মলোধী মলে,
তাঁহারই উজ্জ্বল কিরণ জ্বলে,
তিনি খাতামান্নাবীঈন মুহাম্মদ (সা.)
হাসরে সম্বল বিচার কালে।
শৈশবে শান্ত, গম্ভীর মর্যাদাবান,
তিনি মূর্তিমান কুরআন মুহাম্মদ (সা.)।
মধ্য বয়সে ছিলেন আলামীন,
তিনি রহমাতুল্লিল আলামীন।
তামাম বিশ্বের সাফায়াতকারী রসূল,
যিনি শাফিউল মুযনেবীন, মুহাম্মদ (সা.)
খাতামান্নাবীঈন
সমগ্র বিশ্ব গগণ তলে তাঁহারই উজ্জ্বল
ক্বিরণ জ্বলে,
যিনি খাতামান্নাবীঈন মুহাম্মদ (সা.)
হাসরে সম্বল বিচার কালে।

শতবর্ষে খিলাফত

শরীফ আহমদ আফ্রাদ

আকাশ ভরা তারার মাঝে
দিনের দেখা পাই,
মনের সবুজ রং তুলিতে
ঝান্ডা তুলে যাই।
আমায় দেখে বুঝবে না কেউ
কোথায় আমার দেশ,
নব যুগের গান শুনাব
থেকে পাগল বেশ।
এদিক সেদিক ছুটে বেড়াই
আলোর ঝর্ণা বয়ে,
নতুন বীনে সুর ধরেছি
চলো সে গান গেয়ে।
কাজই মোদের ছুটে চলা
সময় কারো নেই
চলরে ভাই এগিয়ে চল
গান শুনাব সেই।
জগত জুড়ে চলছে খেলা
রঙের ছড়াছড়ি
শত বর্ষের গা ছুয়েছে

হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)-এর বাংলাদেশ সফর

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

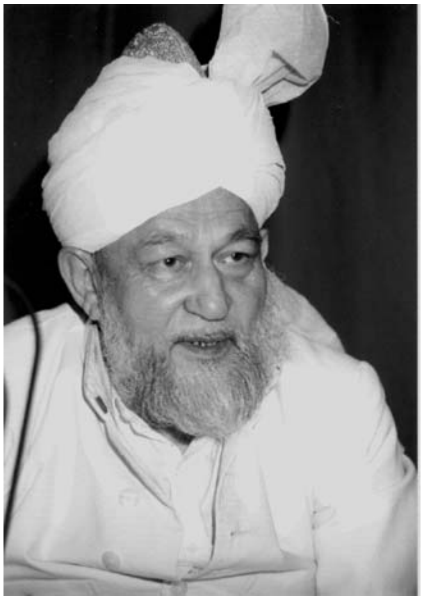

সাহেবযাদা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)

পরে সাহেবযাদা মির্যা সাহেব দিনাজপুর জেলার ভাতগাঁও জামা'ত সফর করেন। তখন ঋতুরাজ বসন্তের বিদায়লগ্ন–এপ্রিল মাসের শেষ দিক। ভাতগাঁও গ্রামটি শ্যামল ছাঁয়া ঘেরার মাঝে মাটির ঘরে প্রসিদ্ধ। গ্রামের অধিকাংশ দরিদ্র কৃষক পরিবার। জামা'তের মসজিদটিও মাটির দেওয়ালের ওপর খড়ের ছাউনীতে নির্মিত। প্রত্যন্ত অঞ্চলের এ গ্রামে মহান ব্যক্তি মির্যা সাহেব সতীর্থ মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব ও হামিদ হাসান খান সাহেবের সাথে পদার্পনে স্থানীয় আহমদীদের প্রাণে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। মসীহেজ্জামানের শিষ্যত্ব গ্রহণকারীদের সাথে ভালোবাসার সেতুবন্ধনকে আরো সুদৃঢ় করার মাধ্যমে তাক্ওয়াপরায়ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাঁর এ শুভাগমন হয়। স্থানীয় জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট ফজলুর রহমান সাহেব তাঁর বাড়িতে আতিথেয়তার ব্যবস্থা করেন। তিনি দু'দিন ভাতগাঁও ছিলেন। জামা'তের সদস্যদের তালিম তরবীয়ত ও নসিহতের উদ্দেশ্যে একাধিকবার সভা করেন। আত্মার আত্মীয়দের বাড়িতে বেড়াতে যান। তখন স্থানীয় সদস্যদের অতিথি সেবার আড়ম্বরতা ছিল না। কিন্তু ভক্তি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিল হৃদয় উজার করা। মাটির ঘরে চেয়ার টেবিল বিহীন শীতল পাটি কিংবা কাঠের পীড়িতে বসার ব্যবস্থায় আবহমান বাংলার বিভিন্ন খাবারে আপ্যায়নের ঐতিহ্য ছিল। তাই বাঙালি প্রেমিক মির্যা সাহেব একদিন সকালে শীতল পাটিতে বসে সখ করে পান্তা আহার করেন। বড়ই তৃপ্ত হন। রাতে কেরোসিনের প্রদীপ জ্বালানো ঘরে বড় বড় মশা কামড়াই। তাঁর এ ভ্রমণ স্মৃতি তিনি কখনও ভুলেননি। তাই ভাতগাঁও জামা'তের সন্তান মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান সাহেব লন্ডনে হুযূর রাবে (রাহে.) সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে নিজের পরিচয় দিতেই মহানুভব জ্ঞানী মানুষ হুযূর আনোয়ার তাঁর ভাতগাঁও সফরের স্মৃতিচারণ করেন। জানতে চান, ভাতগাঁও জামা'তের মাটির মসজিদটি কি পাকা হয়েছে, দৈর্ঘ প্রস্থ কত, জামা'তের লোকজন কেমন আছেন ইত্যাদি। বিস্ময়ের বিষয় বিশ্বের শতকোটি মানুষের মন জয়ে বিশ্ববিজয়ের ঐশী মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দিনরাত যিনি নিরলস পরিশ্রম করেছেন, তিনি বাংলাদেশের একটি ক্ষুদ্র গ্রাম ভাতগাঁও প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বের সফরের কথা সামান্যও ভুলেননি। যেমন কোন শ্রদ্ধাভাজন আদর্শ পিতা দূরদেশে বসে তাঁর সন্তানদের খোঁজ খবর রাখছেন। কেননা তিনি আধ্যাত্মিক জগতের আমাদের পিতাই বটে। ভাতগাঁও সফর প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণে মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান সাহেব একটি নিবন্ধন রচনা করেছেন। তা নিম্নে পত্রস্থ করা হল–

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)

"আজ আকাশকে শূন্য মনে হচ্ছে না। শূন্য মনে হচ্ছে না মাটির পৃথিবীকে। বৃষ্টি, আকাশের ঘনমেঘ,গাছের সবুজ পাতার দোলন, নীরব কোলাহল, শূন্য জনপদে 'একাকিত্ব', আকড়ে ধরে আছে। নি:সঙ্গতায় ভরা জীবনের নৈকট্য মিশে গেছে বৃষ্টির শত সহস্র পানির ফোঁটায়। একাকার হয়েছে বৃষ্টি ও চোখের পানি। এমন নি:সঙ্গ পরিবেশের মাঝে ভরা জীবনের হিতৈষী শ্রদ্ধেয় খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) কথা মনে পড়ে। সান্নিধ্যের আনন্দ ও বিচ্ছেদের দুঃখ ঢেউ খেলে বৃষ্টির লোনাজলে।

পৃথিবীর সব কোলাহল থেকে মুক্ত হয়ে যিনি নূরের 'পরে যাত্রা করেছেন সমাপন, তিনি এতকাছে গভীর হৃদয়ে উষ্ম বিচরণ করেন কিভাবে। উদ্বেলিত মন দৈন্যে ভরা।

'তিনি পান্তাভাত খেয়েছিলেন।' মির্যা তাহের আহমদ সাহেব পান্তাভাত খেয়েছিলেন–একথা যখন ভাতগাঁও জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা জনাব ফজলুর

রহমান ভাই বলেন, তখন স্তম্ভিত হয়ে যাই। অবাক চোখে তাকিয়ে থাকি। আসলেই কাঁদা মাটির প্রলেপে নির্মিত ঘরে শীতল পাটিতে বসে পান্তাভাতে নাশ্‌তা সেরে ছিলেন তিনি। ভাতগাঁও জামা'তের প্রথম আহমদীর অতিথি আপ্যায়নের সফলতার রহস্য কোথায় তা অজানা থেকে গেল। কিন্তু উন্মোচিত হল এক নিরব পারঙ্গম বিপ্লবী খলীফাতুল মসীহ্ রাবের বৈশিষ্ট্য। গ্রাম বাংলার ধনী গরীব সনাতন কাল হতে পান্তাভাতে অভ্যস্ত। হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খৃষ্টান এমনকি শাওতাল, মুন্ডার 'পান্তাভাত' প্রভাতের সঙ্গী। চরম দুর্দিনে কাঁচা মরিচ, লবন আর ঠান্ডা পানি মিশ্রিত ঠান্ডা ভাত বাঁচিয়ে রাখে গরীব অসহায় মানুষকে আকালে। এদের সাথে অবলীলায় হাসি মুখে পান্তাভাত খেয়ে নিজকে সমর্পন করে দুঃখের দিনের বন্ধু হয়েছেন ঐশ্বর্য মন্ডিত সাধক প্রয়াতঃ মির্যা তাহের আহমদ সাহেব। খলিল জীবরানের ভাষায় যে খাদ্যে ভালোবাসা থাকে তা হয় মধুর। বাংলাদেশের গরীব মানুষের ভালোবাসার সুগন্ধ পেয়েছিলেন তিনি। তাই জীবনের শেষ অংশে বাংলাদেশের কথা বলতে ভুলেন নি। আহা! এ পান্তাভাতের দেশে তাঁর আসার বড় সখ ছিল।

কাদিয়ান বা রাবওয়ার উঠানেও তাঁর জায়গা হয়নি। যিশুর উত্তরাধিকারীদের মত গুহায় বাস করছি আমরা। প্রভাতের উদিত সূর্যের আলো আমাদের জাগ্রত করে, আমরা অবলোকন করি আমাদের উত্তম ভবিষ্যতে। যে গুহা মানব মাটির পৃথিবী করেছে নির্মাণ, তাকে বিমোহিত, সম্মানিত, শান্তির বাস যোগ্য করছি এ পৃথিবীকে মসীহের নেতৃত্বে। ঐশী সুখের জগত সৃষ্টি করতে পারছি আমরা। ভবিষ্যত প্রজন্ম অবগাহন করতে ভুলবে না।

আকাশ ভরা এই দিনে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির মাঝে যে বুদবুদের সৃষ্টি হয়, খলীফাতুল মসীহ্ রাবের কথা মনে পড়লে মনও হয় তেমনি উতলা। বৃষ্টির মাঝে আনন্দের কথা লেখা যাবে না।

ওয়াকফে জাদীদের দায়িত্ব পালন কালে তিনি বহুবার তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এসেছিলেন। অনেক বার রংপুর দিনাজপুরের বিভিন্ন জামা'ত পরিদর্শন করেছিলেন। তখনকার রাস্তা ঘাট, যাতায়াত ব্যবস্থা, মাটি ও টিনের তৈরী মসজিদে তাঁর অবাদ সহজ বিচরণ সত্যিই বিস্ময়কর। জনাব হামিদ হাসান খান ছিলেন দিনাজপুর জেলার দ্বার উন্মোচনকারী ও হুযুরের সফল সঙ্গী। এখন এই ধর্ম সাধক আমাদের মুরুব্বী বেঁচে থাকলে অনেক খবর পাওয়া যেত। একবার খাঁন সাহেব তাঁকে পাঁচ টাকা নজরানা দিয়ে কৃতার্থ হয়েছিলেন। রংপুর জেলার খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব ও ধর্মীয় অনুরাগী প্রত্যয়ী মরহুম এডভোকেট বদরউদ্দিন আহমদ বেঁচে থাকলেও অনেক কিছু শুনতে পেতাম। ভবিষ্যত দলিলের জন্যই এখন এই দলিল গৃহিত হওয়ার যোগ্য হতে হবে ভবিষ্যত প্রজন্মকেই।

বৃষ্টি থেমে গেছে। নীলাভ আকাশ ভাসছে। খন্ড খন্ড আকাশের মেঘমালা দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। আর আমার কাছে ভাসছে খলীফাতুল মসীহ্ রাবে'-র ছবি। মনে হচ্ছে কালি দাসের মত মেঘদূতকে পাঠিয়ে দেই জীবনের সকল ইচ্ছার পত্র দিয়ে। এই ইচ্ছা সাতকাহন নয়, সাত আকাশ, সাত সমুদ্রের যিনি অধিকর্তা তার কাছে নিবেদিত করি সূরা ফাতেহার সুন্দরতম সাত আয়াতকে।"

১৯৬২ সালে মির্যা তাহের আহমদ সাহেব এদেশে সফরকালে নাটোরের তেবাড়িয়া জামা'ত সফর করেন। এ প্রসঙ্গে তেবাড়িয়া জামা'তের বর্তমান প্রেসিডেন্ট মহসীন আলী রেজা সাহেব বলেন– 'সাহেবযাদা মির্যা সাহেব দিনাজপুর থেকে আগত ট্রেনে নাটোর রেলস্টেশনে পৌঁছলে তৎকালীন জামা'তের প্রেসিডেন্ট আব্দুস সালাম সাহেব অন্যান্য আহমদীসহ এ মহান অতিথিকে প্রাণঢালা সাদর অভ্যর্থনা জানান। এক্কা গাড়ীতে করে নাটোর চৌধুরী বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে স্থানীয় আহমদীদের সাথে কুশল বিনিময় করেন। চৌধুরী বাড়ীর ঐতিহ্য মতে তাঁকে আপ্যায়ন করা হয়। তখন নাটোর হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা চলছিল। ফলে সকলের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তির নিরাপত্তার জন্য খাদেমদের পাহাড়ায় এক্কাগাড়ীতে তেবাড়িয়া হাট পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। তখন পাকা রাস্তা সেই পর্যন্ত ছিল। সেখান থেকে মহীষের গাড়ী করে মাহমুদনগর জামা'তের মসজিদে আসেন। সেই সময় মাহমুদনগরে জামা'ত ও মসজিদ প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন মসজিদটি ছিল মাটির দেওয়াল ও খড়ের ছাউনি বিশিষ্ট। পরে জামাত ও মসজিদ তেবাড়িয়ায় স্থানান্তরিত করা হয়। মাটির ঘরের মসজিদে বসে তিনি সকলের উদ্দেশ্যে নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন। তাঁর উর্দু বক্তৃতা বঙ্গানুবাদ করে শুনান–মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব। তিনি জামা'তের উন্নতির জন্য খাসভাবে দোয়া করেন।

তখন মির্যা সাহেব একরাত প্রেসিডেন্ট সাহেবের বাড়ীতে অবস্থান করেছিলেন। পরদিন সকালে আমন চাউলের পান্তাভাত ও টাকী মাছের ভর্তা নাস্তা করেন। এতে তিনি খুবই তৃপ্ত হন। প্রশংসা করেন। ফলে তাঁর এই

আতিথেয়তার কথা তিনি স্মৃতিচারণে এমটিএ-তে উল্লেখ করেছেন। সফল সফর শেষে প্রেসিডেন্ট সাহেবের বাড়ি থেকে কড়া নিরাপত্তার মাঝে এক ক্রোশ কাঁচা রাস্তা পায়ে হেঁটে তিনি ইয়াসিনপুর রেলস্টেশনে পৌঁছেন। সেখান থেকে ট্রেনে চড়ে ঢাকা চলে যান। বিদায় বেলায় তাঁর সেবাব্রতী জামা'তের সদস্যগণ তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকেন। আবার সাক্ষাতের আশায় শান্ত্বনা খুঁজেন।'

১৯৭৩ সালে মসজিদ মাহমুদনগর থেকে তেবাড়িয়া স্থানান্তর করা হয় এবং পাকা মসজিদ নির্মিত হয়। তখন হুযূর আনোয়ার হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর কাছে মসজিদের নাম ও দোয়ার জন্য আরজ জানানো হলে, হুযূর এর নাম রাখেন 'মসজিদুল হাশেম'।

১৯৮৬ সালে তৎকালীন জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব জেড এম আব্দুল রাজ্জাক সাহেব মসজিদের বিষয় হুযূরের খেদমতে আরজ করলে ১২ নভেম্বর ১৯৮৬ সালে লিখিত এক পত্রে হুযূর রাবে (রাহে.) বলেন–'May Allah help you to complete the construction of the Mosque at the earliest and may He Make this Mosque a Light house for the Surrounding area, অর্থাৎ–আল্লাহ্ তাআলা মসজিদ নির্মাণের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে আপনাদের সাহায্য করুন এবং এ মসজিদ অত্র অঞ্চলের আহমদীয়াতের **'বাতিঘর'** হোক। তাঁর এ দোয়ার ফলশ্রুতিতে বৃহৎ মসজিদ নির্মিত হয় এবং বর্তমানে সৌরম্য অট্টালিকার আরো বড় মসজিদ নির্মিত হচ্ছে এবং তা ঐশী নূরের আলো বিকিরণে 'দীপ্র বাতিঘর' হিসেবে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠছে।

সে সময় হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) নারায়ণগঞ্জে সফর করেন। তখন নারায়ণগঞ্জ বসবাস করতেন সাহেবযাদা মির্যা জাফর আহমদ সাহেবসহ ক'জন পাঞ্জাবী ধনাঢ্য ব্যক্তি। মির্যা জাফর আহমদ সাহেব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পৌত্র হযরত মির্যা শরীফ আহমদ (রা.) সন্তান। তিনি মির্যা তাহের আহমদ সাহেবের চাচাতো ভাই এবং বর্তমান হুযূর আকদাস (আই.)-এর চাচা। তখন বাঙালি বুযুর্গ ডা: আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী নারায়ণগঞ্জে সপরিবারে থাকতেন। মির্যা তাহের আহমদ সাহেব নারায়ণগঞ্জে বিভিন্ন আহমদীদের বাড়িতে বেড়ায়েছেন। এ প্রসঙ্গে মোহতরমা মাসুদা সামাদ সাহেবা বলেন–

"হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) ১৯৬২ সালে যখন আসেন, তখন আমরা নারায়নগঞ্জে ছিলাম। তিনি একদিন মির্যা জাফর আহমদ সাহেবের স্ত্রীসহ আমাদের বাসায় আসেন। অনেক প্রাণবন্ত আলোচনা হয়। পরে এক শুক্রবারে একাই চলে আসেন। বলেন–খেতে এসেছি। দু'দিন আগে দাওয়াত করেছিলেন। রাখতে পারিনি। তাই আজ চলে এলাম। তিনি আমাদের বাসায় ড্রয়ং রুমে বসেন। আমি ডাইনিং রুমে পর্দার আড়ালে বসি। এদেশের জামা'ত ও বাঙালি আহমদীদের অবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়। তিনি বলেন–বিভিন্ন জামা'ত সফরে উপলব্ধি হলো–বাঙালি মেয়েদের বিয়ের খুব সমস্যা। আমি রাবওয়া গিয়ে কিছু সংখ্যক পাত্র পাঠিয়ে দেবো। তখন আমি বলি–তাহলে তো ভাল হয়। তবে পাঞ্জাবী শ্বাশুরীদের বাঙালি বউদের প্রতি স্নেহমমতা থাকবে তো! অবজ্ঞা করবে না তো! এই মহানুভব মানুষটিও জাতিগত পার্থক্য ভাল বুঝতেন। পরবর্তীকালে তিনি যখন এদেশে সফরে আসেন আমরা তখন ধানমন্ডীতে বসবাস করি। তখনও তিনি আমাদের বাসায় এসেছেন।

তিনি খলীফাতুল মসীহের মসনদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৮৩ সালে আমি রাবওয়া যাই। তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করি। তখন আমার সাথে ছিলেন, আমার ভাই কুতুবুর রহমানের স্ত্রী ও তাঁর মেয়ে। হুযূরের সাথে কুশল বিনিময়ের পর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন–আসেফার সাথে দেখা হয়েছে কি? আসেফা বেগম সাহেবা হলেন হুযূরের সহধর্মিণী। আমি বললাম না। সরাসরি আপনার কাছে চলে এসেছি। তিনি ভিতরে যাওয়ার জন্য নিজেই দরজা খুলে দাঁড়ালেন। আমরা ভিতরে গেলাম। তাঁর বেগম সাহেবা আন্তরিকতার সাথে আমাদের খাবারের জন্য বলেন। কিন্তু আমরা হুযূরের বোন আমাতুল বাসিত সাহেবার বাসায় খাবার খেয়ে যাই। কিছুক্ষণ পর হুযূর আসেন। তাঁর বেগম সাহেবাকে জিজ্ঞাসা করেন–তুমি কি তাদের খাবার দিয়েছো। তখন বেগম সাহেবা না বলতেই হুযূর বলেন–'তুমি তো আচ্ছা মানুষ। তিনি আমার বোন, তাঁকে খাবার দেওনি।' তাঁর এ ভালোবাসা ও স্নেহ মমতা আমি আজীবন পেয়েছি। কাদিয়ান ও রাবওয়ায় বসবাস করার কারণে বাল্যকাল থেকে হুযূর রাবে (রাহে.) কাছ থেকে স্নেহস্পর্শ ও দোয়া লাভের সৌভাগ্য হয়। তাঁর অনেক দোয়ার পত্র সযত্নে সংরক্ষণ করে রাখা আছে।" পরিশেষে দীর্ঘ একমাস বাংলাদেশে সফরের পর বাঙালি আহমদীদের শ্রদ্ধাভাজন প্রাণের মানুষ মির্যা সাহেব ঢাকা থেকে রাবওয়া চলে যান। (চলবে)

জামা'ত অংগসংগঠনসমূহে কর্মতৎপরতার সংবাদ

তরবিয়তী সভা

ক্রোড়া

(১) গত ২৭/৬/০৯ইং রোজ শনিবার বাদ মাগরিব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ক্রোড়ার উদ্যোগে জনাব গাজী মাজহারুল হক খোকনের সভাপতিত্বে মালি কুরবানীর ওপর এক তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভায় তেলাওয়াতে কুরআন ও নযম পাঠ করেন জনাব শামীম আহমদ ভূইয়া ও জনাব তসলিম আহমদ। উক্ত বিষয়ের ওপর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন মৌ. এনামুল হক, মৌ. মোজাম্মেল হক। সর্বশেষে সভাপতি সাহেব এর মূল্যবান ভাষণ, মিষ্টি বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(২) গত ২৬/০৬/০৯ইং রোজ শনিবার বাদ মাগরিব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ক্রোড়ার উদ্যোগে জনাব গাজী মাজহারুল হক খোকন, প্রেসিডেন্ট ক্রোড়া এর সভাপতিত্বে মালী কুরবানী গুরুত্ব এর ওপর এক তরবিয়তী সভা উদযাপন করা হয়। উক্ত সভায় তেলাওয়াতে কুরআন ও নযম পাঠ করেন জনাব শামীম আহমদ ভূইয়া জনাব তসলিম আহমদ। উক্ত বিষয়ের ওপর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন জনাব শরীফ আহমদ চৌধুরী, মৌ. মোজাম্মেল হক, মোয়াল্লেম। পরিশেষে সভাপতি সাহেবের ভাষণ, দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের পর সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

এনামুল হক

ঘাটুরা

(১) গত ১৩ জুন ০৯ শনিবার বাদ মাগরিব জনাব তৌহিদ মিয়ার ঘরে নিয়মিত তরবিয়তী সভা ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব এস, এম, সেলিম সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের পর বক্তৃতা প্রদান করেন যথাক্রমে মৌ. আসাদ উল্লাহ্ আসাদ ও এস, এম, ইব্রাহীম। সভাপতি সাহেব এর সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি হয়। উক্ত সভায় জামা'তের ৬০ জন সদস্য সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

(২) আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঘাটুরায় গত ৩০ মে ০৯ স্থানীয় প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে (তাঁর নিজ ঘরে) তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের পর বক্তৃতা প্রদান করেন মৌ. আসাদ উল্লাহ আসাদ ও মাওলানা নওশাদ আহমদ। সভাপতি সাহেব সমাপনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি করেন। উক্ত সভায় জামা'তের ৯০ জন সদস্য সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ মুছা মিয়া

আঞ্চলিক তরবিয়তী কর্মশালা ০৯ অনুষ্ঠিত

কেন্দ্রীয় কর্মসূচী অনুযায়ী আঞ্চলিক তরবিয়তী কর্মশালা গত ২৪/০৪/০৯ ইং আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় ময়মনসিংহ, জামালপুর, টাঙ্গাইল, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনার অন্তর্গত ৯টি জামা'ত ও ৫টি হালকার প্রেসিডেন্ট ও তরবিয়তী সেক্রেটারীগণ মোট ২৬ জন উপস্থিত ছিলেন। প্রথম অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল তরবিয়ত সেক্রেটারী জনাব কাওসার আলী মোল্লা সাহেব। অধিবেশনের শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করেন মৌ. মোহাম্মদ জাহীদুল ইসলাম, মোয়াল্লেম ময়মনসিংহ। সভাপতির দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শুরু করা হয়। প্রথম অধিবেশনে প্রত্যেক ব্যক্তির পরিচয় প্রদান করা হয়। এরপর স্ব স্ব জামা'তের প্রেসিডেন্ট অথবা প্রতিনিধিরা তাদের জামা'তের তরবিয়তী রিপোর্ট পেশ করেন। উক্ত অধিবেশন ৯-৩০ মিনিট হতে ১২-৩০ মিনিট পর্যন্ত চলে।

২য় অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন জনাব কাওসার আলী মোল্লা ন্যাশনাল সেক্রেটারী তরবিয়ত। এতে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব হাফেজ আব্দুল আলীম। তরবিয়তের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন জনাব মাহবুব আজম রেজা সাহেব, ন্যাশনাল ওয়াকফে জাদীদ–নও মোবাইন সেক্রেটারী। মাওলানা জাফর আহমদ, জোনাল ইনচার্জ। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হাই, প্রেসিডেন্ট ময়মনসিংহ জামা'ত। সবশেষে সভাপতির গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করা হয়।

মোহাম্মদ জাহীদুল ইসলাম

মাতা-পিতা দিবস উদযাপিত

ঘাটুরা

গত ২৭ জুন শনিবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঘাটুরায় মাতা-পিতা দিবস উদযাপন করা হয়,

(আলহামদুলিল্লাহ্)। জনাব নূর মিয়া সাহেবের বাড়িতে বাদ মাগরিব স্থানীয় ভাইস প্রেসিডেন্ট এস, এম, সেলিম সাহেবের সভাপতিত্বে মাতা-পিতা দিবসের আলোচনা সভা আরম্ভ হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের পর মাতা-পিতা সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং পিতা-মাতার উচ্চ মর্যাদা এ সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন যথাক্রমে মৌ. আসাদ উল্লাহ্ আসাদ, জনাব উজ্জল আহমদ, জনাব এস, এম, ইব্রাহীম। সভাপতি সাহেবের সমাপনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সভাশেষে সকলকে রাতের খাবার পরিবেশন করা হয়। উক্ত সভায় জামা'তের ১৫০ সদস্য সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ মুছা মিয়া

তবলীগি সভা অনুষ্ঠিত

ময়মনসিংহ

(১) গত ২৬/০৬/০৯ইং ময়মনসিংহ জামা'তের হালকা ফুলবাড়িয়ার উদ্যোগে বাদ আছর হতে রাত ১১টা পর্যন্ত ৪২ জন জেরে তবলীগের উপস্থিতিতে এক তবলীগি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব আব্দুল হাই, প্রেসিডেন্ট ময়মনসিংহ। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব হাফেয আব্দুল আলীম, দোয়া করান প্রেসিডেন্ট সাহেব। এ তবলীগি সভায় মাওলানা জাফর আহমদ, মৌ. জাহিদুল ইসলাম ও জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের ৩ জন ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন মাওলানা জাফর আহমদ। আলোচনার শেষে ২ জন বয়আত গ্রহণ করেন। দোয়া ও রাত্রের খাবারের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করা হয়।

(২) আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ময়মনসিংহের উদ্যোগে গত ১৩/০৭/০৯ বাদ মাগরিব হতে রাত ১১ টা পর্যন্ত তবলীগি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন মাওলানা জাফর আহমদ। এতে ১৮ জন জেরে তবলীগ ভাই উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে এই সভার কার্যক্রম শেষ হয়।

(৩) আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ময়মনসিংহের হালকার নখলার উদ্যোগে গত ১৪/০৭/০৯ বাদ আসর হতে এশা পর্যন্ত এক তবলীগি সভা অনুষ্ঠিত হয়। আগত মেহমানদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন মাওলানা জাফর আহমদ, জনাব আব্দুল হাই ও খাকসার। উক্ত সভায় ২০ জন জেরে তবলীগ ভাই উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে তবলীগি সভার কার্যক্রম সমাপ্ত হয়। সভা শেষে রাতের খাবার পরিবেশন করা হয়।

মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম

ঢাকার নাখালপাড়া হালকা

গত ১১/০৭/০৯ রোজ শনিবার বাদ আসর ঢাকার নাখালপাড়া হালকায় তবলিগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রায় ৪৫ জন জেরে তবলীগ ভাই উপস্থিত ছিলেন। আগত জেরে তবলীগ মেহমানদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন মাওলানা আব্দুল আউয়াল খাঁন চৌধুরী সাহেব, নায়েব ন্যাশনাল আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।

আলোচনার পর ৩ জন বয়আত গ্রহণ করেন, আলহামদুলিল্লাহ।

(নিউজ ডেস্ক)

খোদ্দামুল আহমদীয়া'র কর্মতৎপরতা

২য় ত্রৈমাসিক কায়েদ পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বৃহঃ দিনাজপুর–পঞ্চগড় জেলা ২য় ত্রৈমাসিক কায়েদ পর্যালোচনা বৈঠক গত ০৩/০৭/০৯ রোজ শুক্রবার সকাল ১২টায় আরম্ভ হয়ে বিকাল ৬টা পর্যন্ত ভাতগাঁও মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

এতে সভাপতিত্ব করেন ঃ ফিরোজ আহমদ, রিজিওনাল কায়েদ, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া রাজশাহী রিজিওন-২। মূল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ আব্দুর রউফ, জেলা কায়েদ বৃহঃ দিনাজপুর–পঞ্চগড় জেলা। শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করেন সালমান আহমেদ। আহাদ পাঠ করান সভাপতি সাহেব। দোয়া পরিচালনা করেন মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম। নযম পাঠ করেন সালেহ আহমদ (সুমন) । এই পর্যায়ে উপস্থিত সকলের নাম, পদবি, মজলিস পরিচিতি নেয়া হয়। নবাগত রিজিওনাল কায়েদ ও জেলা কায়েদ শুভেচ্ছা ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন। বিগত কয়েক মাসের রিপোর্ট নেয়া হয় এবং আগামি কায়েক মাসের কাজের টার্গেট দেওয়া হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন ৮টি মজলিসের মধ্যে ৭টি মজলিস ঃ (১) ডোহান্ডা, (২) ভাতগাঁও, (৩) আহমদনগর, (৪) শালশিড়ী, (৫) হেলেঞ্চাকুড়ি, (৬) বীরগঞ্জ, (৭) দিনাজপুর। পরিশেষে জেলা কায়েদ এবং রিজিওনাল কায়েদ নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন ও বার্ষিক কর্মসূচী ও কাজের টার্গেট সঠিক ভাবে

পালন করার অনুরোধ করেন। সবশেষে দোয়া করান মৌ. তাহের আহমদ, মোয়াল্লেম, ভাতগাঁও।

মোহাম্মদ আব্দুর রউফ

১১তম জেলা ইজতেমা অনুষ্ঠিত

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বি-বাড়িয়া–কুমিল্লা জেলা মজলিসের উদ্যোগে গত ৯ ও ১০ জুলাই ২ দিন ব্যাপী ১১তম ইজতেমা মসজিদে বায়তুল ওয়াহেদ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। ৯ তারিখ সকাল ৭ টায় কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে মোহতরম রিজিওনাল কায়েদ জনাব এস, এম, ইব্রাহীম সাহেবের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয়। এতে নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন মোহতরম জেলা কায়েদ শেখ সাব্বির আহমদ উজ্জল, অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন শেখ সাদী, চেয়ারম্যান ইজতেমা কমিটি।

ইজতেমা উপলক্ষে বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতা নেয়া হয়। পরের দিন বিকাল ৪ টায় সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম সদর সাহেবের প্রতিনিধি জনাব শরীফুল হাকীম সাহেব, মোহতামীম ইশায়াত। আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহতরম মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন, আমীর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

সভাপতি সাহেবের ভাষণ, পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে ১১তম জেলা ইজতেমার কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘটে। ১১তম এই ইজতেমায় খোদ্দাম আতফালসহ সর্বমোট ২০৫ জন অংশগ্রহণ করেন।

জুবায়ের আহমদ রতন

লাজনা ইমাইল্লাহ্'র কর্মতৎপরতা

লাজনা ইমাইল্লাহ্ চরসিন্দুরের ১ম স্থানীয় ইজতেমা অনুষ্ঠিত

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, লাজনা ইমাইল্লাহ্ চরসিন্দুরের উদ্যোগে গত ৯ ও ১০ই জুলাই স্থানীয় মসজিদে ১ম স্থানীয় ইজতেমা চরসিন্দুর লাজনা ইমাইল্লার প্রেসিডেন্ট সাহেবার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত ইজতেমা উপলক্ষে বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতা নেয়া হয়। ১০ জুলাই ইজতেমা উপলক্ষে কেন্দ্র থেকে মোহতরমা সদর সাহেবা, জেনারেল সেক্রেটারী সাহেবা ও অডিটর সাহেবা যোগদান করেন। কেন্দ্রীয় মেহমানগণের মূল্যবান বক্তব্য ও পুরস্কার বিতরণী এবং দোয়ার মাধ্যমে ১ম লাজনা ইমাইল্লাহ্ চরসিন্দুরের ইজতেমার সমাপ্তি ঘটে।

রিপা

চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র খিলাফত দিবস উদযাপন

গত ১৯/০৬/০৯ইং রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রামের উদ্যোগে খিলাফত দিবস উদযাপিত হয়। এতে কুরআন তেলাওয়াত করেন আমবার মুত্তাসিন ও মুসাররাত আফরিন। হাদীস–নুজহাত নাসিমা, অমৃতবাণী–নাইমা বুশরা– খিলাফতের আনুগত্য– তালাত মেহতাব, খিলাফতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য–নিলুফার মমতাজ। এই মহতী অনুষ্ঠানে ৯০ জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন। সভানেত্রী নাইমা বুশরা, সেক্রেটারী সাহেবার দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

রোকশানা বেগম

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত চরসিন্দুরের মসজিদ উদ্বোধন

গত ১২/০৬/০৯ শুক্রবার মোহতরম মোবাশ্‌শের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর জুমুআর নামায পড়ানোর মাধ্যমে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত চরসিন্দুরের নবনির্মিত পাকা মসজিদ-এর শুভ উদ্বোধন হয়। আলহাম্‌দুলিল্লাহ্।

ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সফরসঙ্গী হিসেবে ছিলেন জনাব জাহিদুর রহমান, জেনারেল সেক্রেটারী, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ, জনাব মোহাম্মদ সাহাবউদ্দিন, নায়েব ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ। উদ্বোধনী ভাষণে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব বলেন, আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে বলেছিলেন "তোমার ঘরকে প্রশস্ত কর" এরই ধারাবাহিকতায় চরসিন্দুর জামা'তে সুন্দর বড় একটি পাকা মসজিদ নির্মিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আমাদের সবার দায়িত্ব হলো ইবাদতের মাধ্যমে মসজিদকে আবাদ করা।

মসজিদের নামকরণ করা হয় 'মসজিদুল মাহদী'। এই নবনির্মিত মসজিদে একসাথে ১৫০ জনেরও বেশী মুসল্লী নামায আদায় করতে পারবে। মসজিদের শুভ উদ্বোধণের পর সভার মাঝে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

এস, এম, মাহমুদুল হক

১০ম ওয়াকফে নও ক্লাস ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত

ওয়াকফে নও তালিম তরবিয়তী ক্লাসে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে নসিহতমূলক বক্তব্য রাখছেন ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও মোহাম্মদ সাদেক দূর্গারামপুরী সাহেব।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নারায়ণগঞ্জ-এর উদ্যোগে গত ১৫-০৬-২০০৯ইং তারিখ হতে ১৯-০৬-০৯ইং তারিখ পর্যন্ত ৫ দিন ব্যাপী ১০ম ওয়াকফে নও তালিম তরবিয়তী ক্লাস ও সম্মেলন সাফল্যজনক ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্লাসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় আমীর, মোহতরম এডভোকেট তাইজউদ্দিন আহমদ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতি সাহেব ওয়াক্‌ফে নও সন্তান ও পিতামাতার দায়িত্ব কর্তব্যের প্রতি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

৫ দিন ব্যাপী উক্ত ক্লাসে নির্ধারিত পাঠ্যসূচী অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে তালিম প্রদান করা হয় এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতা নেয়া হয়। ১৯-০৬-০৯ইং তারিখে উক্ত তালিম তরবিয়তী ক্লাস ও সম্মেলন ২০০৯ ইং এর সমাপনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী অধিবেশনে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও মোহতরম সাদেক দূর্গারামপুরী সাহেব। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় আমীর, মোহতরম এডভোকেট তাইজউদ্দিন আহমদ সাহেব। উক্ত অনুষ্ঠানে স্থানীয় মোয়াল্লেম মৌ. হাফেয আবুল খায়ের সাহেব এবং স্থানীয় ওয়াকফে নও সেক্রেটারী মোহতরম ডাঃ মুজাফ্‌ফর উদ্দিন আহমদ ওয়াকফে নও সন্তান ও পিতামাতার উদ্দেশ্যে নসিহত মূলক জ্ঞানগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। শেষে বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষা ও খেলা-ধূলায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সমাপনী অধিবেশণে আমন্ত্রিত অতিথি সহ প্রায় ৬০ জন দর্শক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে সম্মেলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ডাঃ মুজাফ্‌ফর উদ্দিন আহমদ

মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌'র কর্মতৎপরতা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

গত ২৬/০৬/২০০৯ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ভাদুঘর হালকার পূর্ব পাড়ায় বাদ মাগরিব মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র উদ্যোগে সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্‌। জনাব খন্দকার সাঈদ আহমদ নায়েব যয়ীম আলা আউয়াল সাহেবের সভাপতিত্বে আমীর সাহেবের উপস্থিতিতে সভার কাজ আরম্ভ হয়। সভার শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব নেয়ামত উল্লাহ্‌। নযম পাঠ করেন মোহাম্মদ শাহ আলম। তারপর রসূল পাক (সা.) এর সীরাতের ওপর যথাক্রমে (১) দায়ী ইলাল্লাহ্‌ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন–মৌ. এনামুল হক রনি। (২) রসূল করীম (সা.)-এর জীবনের কয়েকটি দিক নিয়ে আলোচনা করেন–মোশারফ হোসেন, যয়ীম আলা। (৩) রসূল করীম (সা.)-এর মানব প্রেম ক্ষমা ও মহত্ত্বের দিক নিয়ে বক্তৃতা করেন মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন, আমীর বি. বাড়িয়া। (৪) রসূল করীম (সা.)-এর জীবনাদর্শ নিয়ে আলোচনা করেন মাওলানা নওশাদ আহমদ, সকল বক্তাগণই বিশেষ করে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর আদর্শের ওপর কায়েম থাকার আহ্বান জানান। সভাপতির দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। উক্ত সভায় মোট ৭৮ জন সদস্য সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

শেখ মোশারফ হোসেন

‘নবীনেতা (সা.)’-পুস্তকের ওপর সেমিনার

নারায়ণগঞ্জ

মহান আল্লাহ্ তাআলার অশেষ মেহেরবাণীতে মজলিস আনসারুল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ-এর উদ্যোগে গত ১৯-০৬-২০০৯ইং রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ স্থানীয় মসজিদ কমপ্লেক্সে হযরত মির্যা বশির উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) প্রণীত নবীয়ূকা সরদার (সা.) নবীনেতা পুস্তকের ওপর এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন মঈন উদ্দিন আহমদ, যয়ীমে আলা, মজলিস আনসারুল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ। সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন সর্বজনাব আহমদ আলী সাহেব। অত:পর আহাদ নামা পাঠ একং দোয়ার মাধ্যমে সেমিনারের শুভ সূচনা করা হয়। হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.) প্রণীত নবী নেতা (সা.) পুস্তকের ওপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সর্বজনাব রফি উদ্দিন আহমদ, হেলাল উদ্দিন আহমদ, আহমদ আলী, শামসুল আলম, শরীফ আহমদ এবং মনির উদ্দিন আহমদ। পরিশেষে সভাপতি সাহেবের ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মঈন উদ্দিন আহমদ

‘কিসতিয়ে নূহ’ পুস্তকের ওপর সেমিনার

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

গত ২০ জুন নব নির্মিত ৩য় তলা মসজিদ বায়তুল ওয়াহেদে বাদ মাগরিব জনাব খন্দকার সাঈদ আহমদ নায়েব যয়ীমে আলা আউয়াল সাহেবের সভাপতিত্বে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) রচিত কিসতিয়ে নূহ পুস্তকের ওপর সেমিনারের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রথমে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব নাছির আহমদ। তারপর উক্ত পুস্তিকার তাৎপর্যের আলোকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন আব্দুল আজিজ, শেক মোশারফ হোসেন এবং মাওলানা নওশাদ আহমদ। পরিশেষে সভাপতি সাহেব বইটির গুরুত্বের ওপর আলোচনা করেন এবং দোয়ার মাধ্যমে সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

যয়ীমে আলা

‘আল ওসীয়্যত’ পুস্তকের ওপর সেমিনার

উথলী

গত ২৬/০৬/২০০৯ইং তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত উথলীতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) রচিত ‘আল ওসীয়্যত’ পুস্তকের ওপর এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মুয়াযযেম আহমদ সানী। আল ওসীয়্যত কিতাবের ওপর আলোচনা করেন, সর্বজনাব রাজিব মাহমুদ চৌধুরী, সরফরাজ আব্দুস সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী, শাহীনুর ইসলাম, মৌ. মোজাফ্ফর আহমদ রাজু, পরিশেষে সভাপতির জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা ও দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

মোহাম্মদ আবুল হায়াত বিশ্বাস

খিলাফত দিবস উদযাপন

উথলী

গত ২৯/০৫/২০০৯ইং রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত উথলীর উদ্যোগে আহমদীয়া খিলাফতের দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম খিলাফত দিবস মহান আল্লাহ্ তাআলার অশেষ শুকরিয়া আদায় করে উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। এতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মুয়াযযেম আহমদ সানী, নযম পাঠ করেন জনাব কায়েদ সাহেব। উক্ত অনুষ্ঠানে অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন খিলাফতের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। নেযামে খিলাফত বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব রাজিব আহমদ চৌধুরী, ইসলামে খিলাফত এ বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব আব্দুস সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী, খিলাফতের গুরুত্ব ও খিলাফতে আহমদীয়া বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব গফুর সাহেব। পরিশেষে সভাপতি সাহেবের দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

মোহাম্মদ আবুল হায়াত বিশ্বাস

কটিয়াদী

গত ২৯/০৫/০৯ইং রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত কটিয়াদীতে খিলাফত দিবস উদযাপন করা হয়।

এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব এম, এ, হান্নান, প্রেসিডেন্ট। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব খলিল আহমদ, বক্তৃতা প্রদান করেন যথাক্রমে খলিল আহমদ, মৌ. বশির আহমদ, ডা. রুহুল আমীন, সবশেষে প্রেসিডেন্ট সাহেবের সমাপনী ভাষণ ও দোয়া এবং মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সর্বমোট ৬৫ জন সদস্য সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

আব্দুল হাদী খোকন

শোক সংবাদ

(১) গত ১৯ জানুয়ারী ২০০৯ইং রোজ সোমবার সকাল ৯-০ মি. আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সদস্য কান্দিপাড়া নিবাসী জনাব ফারুক আহমদ ভূইয়া প্রেসার স্ট্রোক করে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তিনি উত্তর আহমদী পাড়া হালকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে জামা'তের খেদমত করার সুযোগ লাভ করেছিলেন। মরহুম মাত্র ৯ বছর বয়সে পিতৃহারা হন। তিনি ক্রোড়া নিবাসী মরহুম আবছার উদ্দিন ভূইয়া সাহেবের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি একজন ওসীয়্যতকারী ছিলেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে মরহুমের জানাযা নামাযের পর মুসিয়ানদের জন্য নির্ধারিত কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে মরহুম ৩ ছেলে, ২ মেয়ে, স্ত্রী ও নাতি-নাতনী সহ অসংখ্য শুভাকাঙ্খি রেখে যান।

মরহুম নূরুল ইসলাম চক্রবর্তীর জামাতা ছিলেন। মরহুম অত্যন্ত সাদাসিধে, সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত আহমদী ছিলেন। মরহুমের আত্মার মাগফিরাত ও জান্নাত লাভের জন্য সকলের নিকট দোয়াপ্রার্থী।

মাকসুদা ফারুক

(২) অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি যে, গত ২৫/০৬/০৯ইং ভোর ৪-৩০ মি. এর সময় মাহীগঞ্জ জামা'তের মরহুম আব্দুল হামিদ মুন্সির ২য় পুত্র আব্দুর রাজ্জাক হার্ট এটাক করে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৮ বৎসর। আল্লাহ্ তাআলা তাকে জান্নাতবাসী করুন। মরহুম মৃত্যুকালে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও নাতি-নাতনী রেখে যান। তার পরিবার পরিজনকে আল্লাহ্ তাআলা যেন সাবরে জামিল দান করেন, জামা'তের সকল ভাই ও বোনদের নিকট মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি। মরহুম রংপুর জামা'তের প্রেসিডেন্ট মমতাজ উদ্দীন আহমদ সাহেবের ছোট ভাই দোয়া প্রার্থী।

খুরশীদ আহমদ

(৩) অত্যন্ত দু:খের সঙ্গে জানানো যাচ্ছে যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত চরসিন্দুরের প্রবীন আহমদী জনাব আলহাজ্জ মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমদ গত ২৮ এপ্রিল ০৯ রোজ মঙ্গলবার রাত ১০-৩০ মিনিটে এই নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে মহান খোদা তাআলার দরবারে ফিরে যান। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহির রাজিউন। মৃত্যুকালে মরহুমের বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর। উল্লেখ্য মরহুমের ৭ ভাইয়ের মধ্যে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। মরহুম অত্যন্ত বিনয়ী, সদালাপি, জামা'তের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন চরসিন্দুর জামা'তের সেক্রেটারী মাল এর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সুনামের সাথে পালন করেন। জামা'তের আর্থিক কুরবানীর যখন যে তাহরীক মরহুমের কাছে পৌঁছেছে তাতে তিনি অংশগ্রহণ করতেন। মৃত্যুকালে মরহুম স্ত্রী, ১ কন্যা (পালিত) ও অনেক গুণগ্রাহী রেখে যান। মরহুমের জানাযার নামায কেন্দ্র থেকে আগত আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক সাহেব পড়ান। জানাযা শেষে চরসিন্দুর মসজিদে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের প্রতিনিধি মোহতরম মোহাম্মদ সাহাবউদ্দিন, নায়েব ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে মরহুমের স্মরণে এক যিকরে খায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত যিকরে খায়ের সভায় বিভিন্ন বক্তাগণ মরহুমের উত্তম আদর্শের স্মৃতিচারণ তুলে ধরেন। শেষে সভাপতি সাহেবের সংক্ষিপ্ত ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে উক্ত যিকরে খায়ের সভা সমাপ্ত হয়। মহান আল্লাহ্ তাআলা মরহুমকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্যধারণ করার তৌফিক দিন, আমীন।

দোয়াপ্রার্থী

এস, এম, মাহমুদুল হক

(৪) দু:খের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, পিতা-মৃত মোহাম্মদ হামিদ মুন্সি, গ্রাম দেওয়ানটুলি, মাহিগঞ্জ, রংপুর গত ২৫ জুন ৭-৩০ মিনিটে তার নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহির রাজিউন। মৃত্যুকালে মরহুমের বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। মরহুম মৃত্যুকালে ২ ছেলে, ৩ মেয়ে, ৭ নাতি নাতনী রেখে যান। মরহুম সহজ সরল জীবন যাপন করতেন। মহান আল্লাহ্ তাআলা যেন মরহুমকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্যধারণ করার তৌফিক দিন, আমীন।

দোয়াপ্রার্থী

মোহাম্মদ আব্দুর রাহীম

শুভ বিবাহ

* গত ০৫/০৩/০৯ইং মোছা ঃ রোজিনা বেগম পিতা-ইসমাইল সরকার, ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাথে মোস্তফা তুহিন, পিতা-এম, জামান, কাজী পাড়া এর বিবাহ ১,২০,০০০/- (এক লক্ষ বিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ৭৮৫/০৯

* গত ২৭/০৩/০৯ইং মোছা ঃ আফরিন নাহার, পিতা-মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, শালগাঁও বি, বাড়িয়ার সাথে মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, পিতা-মরহুম সামের আলী, মৌড়াইল, নগরবাড়ী এর বিবাহ ১,৫০,০০১/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ৭৮৬/০৯

* গত ০১/ ০৫/ ০৯ইং মোছাঃ ছাবেকুন্নাহার পুশি, পিতা-ছালাহ্ উদ্দিন আহমদ, ক্রোড়া, বি, বাড়িয়ার সাথে জাহাঙ্গীর আলম, পিতা-মোহাম্মদ চন্নু মিয়া, বড় কালি শীমা, এর বিবাহ ১.১০,০০০/- (একলক্ষ দশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ৭৮৭/০৯

* গত ২১/০৫/০৯ইং মোছাঃ দ্বীনা নাছরিন রানা, পিতা-মীর মোহাম্মদ ভূঁইয়া, বিষ্ণুপুর, বি,বাড়িয়া এর সাথে আব্দুল্লাহ্ আল মনি তৌফিক, পিতা-আলহাজ্জ আলী আহমদ, ২৩, মকরুবা রোড, নগর খানপুর নারায়ণগঞ্জ এর বিবাহ ১,০০,০০১/- (একলক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ৭৮৮/০৯

* গত ১২/০২/০৯ইং মোছাম্মাৎ জেবুন্নেছা পিতা-মুহাম্মদ আব্দুস সাদেক, কোলদিয়ার, মাইজদিয়ার, কুষ্টিয়া এর সাথে মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম পিতা-মোহাম্মদ মোজাফ্ফর আলী সংকরটপ, রঘুপাড়া, রাজশাহী এর বিবাহ ২০,০০১/- (বিশ হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ৭৮৯/০৯

* গত ২৬/০৫/০৯ মোছাঃ হেলেনা আক্তার খানম, পিতা-ঈদ মোহাম্মদ খাঁন, ৪৬০, কান্দিপাড়া, বি,বাড়িয়া-এর সাথে খালেদ মাহমুদ সুজন, পিতা-খোরশেদ আহমদ, ১১৬, বি বি রোড, নারায়ণগঞ্জ এর বিবাহ ১,২৫,০০০/- (একলক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ৭৯০/০৯

* গত ১৮/০৭/০৯ইং মোছা:মারুফা খাতুন, পিতা-মোহাম্মদ আব্দুল করীম, ফ্ল্যাট নং- বি-৯, ডোমিনোসিটিডেন্ট ১৫৪, শান্তিনগর এর সাথে সাকিব মোহাম্মদ তারেক হাসান, পিতা-আব্দুল ওয়াদুদ এর বিবাহ ৬,০০,০০০/- (ছয়লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ৭৯১/০৯

ওয়াকফে নও পরিচিতি

নাম ঃ তিবুল জান্নাত নিশা - ওয়াকফে নও নং- ৮০৭৬-বি
পিতা ঃ মৌ. মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম (মোয়াল্লেম), মাতা ঃ নূরে জান্নাত।
দাদা ঃ মরহুম মোতাহার হোসেন সিকদার (ঝালকাঠি)
নানা ঃ মোহাম্মদ হানিফ মিয়া (আহমদনগর)

কৃতী ছাত্রী

আমাদের ছোট মেয়ে নাহিদ ইসলাম ২০০৯ সনে অনুষ্ঠিত এস, এস, সি পরীক্ষায় গোল্ডেন জিপি-এ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্।

সে ঢাকাস্থ মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী। সে সকলের কাছে দোয়াপ্রার্থী। সে একজন ওয়াকফে নও, নং ৮৪৩০এ।

পিতা : মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম
মাতা : ডা: মাহমুদা ইসলাম

সুস্থ্য থাকতে পাতিলেবু

লেবু আমাদের দেশে প্রায় বার মাসই কম বেশি পাওয়া যায়।

বৈজ্ঞানিক মতে ঃ লেবুর টক রসে আছে সাইট্রিক এসিড। লেবুর রস পেটের সব জীবানু ধ্বংস করে। রক্ত শুদ্ধ করে। এতে আছে প্রোটিন, চর্বি, প্রাকৃতিক লবণ, শর্করা, ক্যালসিয়াম, পটাশ, ফসফরাস আর লোহা। লেবুতে ভিটামিন সি বেশি পরিমাণে আছে। অতএব স্কার্ভি ও রক্তপিত্ত রোগে লেবুর রস খুব উপকারী। দাঁত থেকে রক্ত পড়া বন্ধ করে। এতে ভিটামিন বি-ও আছে।

- সকাল বেলা খাওয়ার আগে খালিপেটে একটা পাতিলেবুর রস গরম পানিতে মিশিয়ে খেলে লিভারের দোষ ও পিত্তের দোষ সারে আর স্বাস্থ্যও ভাল থাকে।
- এক পেয়ালা কড়া-চায়ে একটা পাতিলেবুর রস মিশিয়ে খেলে মাথা ধরা সারে ও মন চাঙ্গা হয়ে ওঠে।
- পাতিলেবুর রস বহুমূত্র রোগে উপকারী।
- স্কার্ভি ও অস্থিসংক্রান্ত রোগে টাটকা লেবুর রসই মহৌষধি।
- কয়েক ফোঁটা পাতিলেবুর রস পানিতে মিশিয়ে পান করলে চোখের জ্যোতি বাড়ে।
- শীতকালে হাত-পা জ্বালা করলে ত্বক বা চামড়া ফেটে গেলে গ্লিসারিনের সঙ্গে লেবুর রস মিশিয়ে মাখলে উপকার পাওয়া যায়।
- চুলকানিতে, গায়ে সূর্য্যের বেশি তাপ লেগে গেলে যে কষ্ট হয় তাতে লেবুর রস বিশেষ উপকারী।
- বিছে বা বিষাক্ত পোকা যে জায়গায় কামড়েছে সে স্থানে লেবু ঘষলে জ্বালা কমে যায়।
- শরীরের কোন জায়গা কেটে গেলে এক টুকরো কাপড়ে লেবুর রস ভিজিয়ে সেখানে জড়িয়ে রাখলে রক্ত পড়া বন্ধ হয়।
- লেবু টক হলেও অম্লজনক নয়। অল্প পরিমাণে লেবুর রস খেলে অম্লত্ব নষ্ট হয়ে যায় এবং ক্ষারগুণ বৃদ্ধি পায়।

পাতিলেবুর আরো কিছু গুণ

- দুই চা-চামচ লেবুর রস ও দুই চা-চামচ আদার রস মিশিয়ে তাতে একটু চিনি মিশিয়ে খেলে বদহজমজনিত সব রকমের পেট ব্যাথা সারে।
- লেবু আর পেঁয়াজের রস ঠান্ডা পানিতে গুলে খেলে বদহজমের জন্যে যে পেটের অসুখ হয় তাতে উপকার হয়–এমনকি কলেরাতেও উপকার পাওয়া যায়।
- শোয়ার সময় লেবুর রস গরম পানিতে গুলে খেলে সর্দি সারে। কিছুদিন ধরে এভাবে খেলে পুরনো সর্দিও সেরে যায়।
- অল্প লেবুর রস মধুর সঙ্গে মিশিয়ে চেটে খেলে প্রবল কাশি সেরে যায়। হাঁপানির আক্রমণ তৎক্ষণাৎ থেমে যাওয়ায় আরাম পাওয়া যায়।
- লেবুর রস আঙ্গুলি লাড়িয়ে দাঁতের মাড়িতে মালিস করলে দাঁত থেকে রক্ত পড়া বন্ধ হয়।
- লেবুর রসে মধু মিশিয়ে বাচ্চাদের চাটিয়ে দিলে বাচ্চাদের দুধ তোলা বন্ধ হয়।
- লেবুর রসে চিনি ও পানি মিশিয়ে এক মাস ধরে রাতে শোয়ার আগে খেলে বহু পুরোনো কোষ্ঠকাঠিন্য সেরে যায়।
- একটি পাকা পাতিলেবুর রসে অল্প মধু মিশিয়ে চাটলে শরীরের স্থুলতা কমে ও শরীরে স্ফুর্তি আসে।
- পাকা পাতিলেবুর রসে সমপরিমাণ মধু দিয়ে অল্প গরম পানি মিশিয়ে আহারের পর সঙ্গে সঙ্গেই পান করে নিলে এক-দু মাসের মধ্যেই মেদ-বৃদ্ধি কমে যায় এবং শরীরে বেড়ে যাওয়া মেদও ঝরে যায়।
- লেবুর রসে সর্ষের তেল মিশিয়ে ফুটিয়ে নিন। ঠাণ্ডা হলে ছেঁকে শিশিতে ভরে রাখুন। কানে দু ফোঁটা করে দিলে-পুঁজ পড়া, চুলকানি, কানের ব্যাথা এমনকি বধিরতার উপশম হবে।
- লেবুর খোঁসা লেবুর রসে পিষে পুলটিস তৈরী করে গরম করে বাঁধলে বা লেবুর রস ঘসলে নানা কারণে ত্বকের যে দাগ পড়ে তা দূর হয়।
- লেবু আর সর্ষের তেল সমপরিমাণে মাথায় লাগিয়ে তারপরে টক দই দিয়ে ঘষে মাথা ধুয়ে ফেললে–মাথায় ছোট ছোট ফুস্কুরি হওয়া ও মাথার চামড়া শক্ত হয়ে যাওয়ার উপকার পাওয়া যায়।
- লেবুর রস মাথায় ভাল করে ঘষে নিয়ে চুল ধুয়ে ফেললে চুলের ময়লা দূর হয় এবং মাথার চুলকানি সারে। আর এতে চুল চকচকে আর পরিষ্কার দেখা দেবে।
- এক বালতি গরম বা ঠাণ্ডা পানিতে একটি লেবুর রস দিয়ে সেই পানিতে গোসল করলে চামড়া নরম ও উজ্জ্বল হয়।

সংকলন ও উপস্থাপনা ঃ **সুমন মাহমুদ**

এপক্ষের কৃষি

১ আগস্ট হতে ১৫ আগস্ট/২০০৯
১৭ শ্রাবন হতে ৩১ শ্রাবন/১৪১৬

এ পক্ষের কৃষি পাতায় আপনাদের মাঝে কিছু গুরুত্তপূর্ণ বিষয় নিয়ে হাজির হয়েছি। বিষয় গুলি আপনাদের জানা । শূধু আপনাদের স্মরণ করিয়ে দেয়াই আমার উদ্ধেশ্য। গত মাসে পর্যাপ্ত স্বাভাবিক পরিমান বৃষ্টি না হওয়ায় এপক্ষ কালটি কৃষক ভাইদের জন্য খুবই গুরুত্তপুর্ণ হয়ে দাড়িয়েছে। আমন আমাদের দেশে প্রধান ফসল । ভাল ফলন পেতে হলে এ পক্ষকালের মধ্যে আমন রোপন শেষ করুন।

চাষী ভাই এপক্ষকালে নিম্নবর্ণিত কাজগুলি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করা যেতে পারে:-

(১) আমন চাষ :-চাষী ভাই, এবৎসর স্বাভাবিকের চেয়ে বৃষ্টি অনেক কম হয়েছে। বিগত বৎসর গুলিতে বৃষ্টির পানিতে আমনের চারা রোপন করা হতো। উফশী জাতের আমনের চারা রোপনের সময় দ্রুত চলে যাচ্ছে। অমনের চাষ বিলম্ব হলে ফলন কম হবে। রবি মৌসুমের চাষে বিঘ্ন হবে। সেচ সুবিধা থাকলে বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা না করে সেচ দিয়ে জমি তৈরি করে আমনের চারা রোপন করুন।

চাষী ভাই, আমন চাষে নিম্নোক্ত হারে সার প্রয়োগ করতে পারেন। তবে জমির উর্বরতা এবং পূর্ববর্তী চাষকৃত ফসলের উপর ভিত্তি করে সারের মাত্রা কমবেশী করা যেতে পারে।

*** সারের মাত্রা:-**

ইউরিয়া	= ৪৫ কেজি/ একর।
টিএসপি	= ৩০ কেজি/ একর।
এমওপি	= ২০ কেজি/ একর।
জিপসাম	= ১৫ কেজি/ একর।
জিং সালফেট	= ২ কেজি/ একর।

বি:দ্র:- দস্তা সার একবার পরিমিত পরিমান ব্যবহার করলে পরবর্তী ৩ ফসলের জন্য ব্যবহার করার প্রয়োজন নাই।

জৈব সার প্রয়োগ:- জৈব সার মাটির উর্বরতার চালিকা শক্তি। তাই জমিতে বৎসরে অন্তত একবার (পঁচা গোবর, আর্জনা, কম্পোস্ট, ধৈঞ্চা ইত্যাদি) ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি:-

(ক) শেষ চাষে প্রয়োগ:-

ইউরিয়া সার ছাড়া অবশিষ্ট সকল সার শেষ চাষে উত্তমরূপে ছিটিয়ে প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

(খ) উপরি প্রয়োগ:-ইউরিয়া সার সমান দুই কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম কিস্তি চারা রোপনের ২০ দিনে মধ্যে , দ্বিতীয় কিস্তি চারা রোপনের ৫০-৫৫ দিনে মধ্যে প্রয়োগ করা হলে ভাল ফলন পাওয়া যাবে।

(গ) আগাছা দমন:- চাষী ভাই, খরিফ মৌসুমে ধান খেতে প্রচুর আগাছা জন্মে। আপনি জানেন যে, আগাছা গাছের প্রত্যক্ষ শত্রু। তাই খেত আগাছা মুক্ত রাখুন। রোপনের পর ৩০-৪০ দিন পর্যন্ত আমনের খেত আগাছা মুক্ত রাখলে আপনি ভাল ফলন পাবেন।

দক্ষিণ অঞ্চলে আমন চাষ:

দক্ষিণ আঞ্চলের চাষী ভাইয়েরা এ পক্ষকালের মধ্যে উচু জমিতে আমন লাগানো শেষ করুন। এছাড়া নাবী আমনের চারার যত্ন নিন।

চাষী ভাই, পরের পক্ষে রোগ এবং বালাইয়ের আক্রমন ও দমন

ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হবে।

(২) ডাল জাতীয় ফসল চাষ:- চাষী ভাই, আউশ এবং পাট কাটার পর আপনি ডাল জাতীয় ফসল; মুগ, মাষকালাই চাষ করতে পারেন। তবে আপনি পরবর্তীতে কোন ফসল চাষ করবেন তার উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যদি আপনি আগাম কপি, মূলা এবং টমেটো চাষ করতে চান তা হলে সে জমিতে গো খাদ্য হিসাবে ডাল জাতীয় ফসল চাষ করতে পারেন।

(৩) গ্রীষ্মকালীন সব্জী চাষ:- চাষী ভাই, এপক্ষকাল থেকে গ্রীষ্ম মৌসুমে চাষকৃত সব্জীর বীজ রাখার উত্তম সময়। চাষী ভাই নিজের প্রয়োজনীয় বীজ নিজে রাখুন । স্বাবলম্বী হোন। বীজ রাখার কৌসলের জন্য খাকসারের সাথে যোগাযোগ করুন।

(৪) শীতকালীন সব্জি চাষ:-শীতকালীন সব্জী চাষের জন্য বসত বাড়ীর আঙ্গিনা এবং জমি প্রস্তুত করুন। বিশেষ করে আগাম বেগুন, কপি, টমেটোর চারা করার জন্য বীজতলা প্রস্তুত করুন।

(৫) বৃক্ষ রোপন:- চাষী ভাই, এ পক্ষকালে বৃক্ষ রোপন করতে পারেন। বিশেষ করে ফল গাছের চারা লাগান। নতুন লাগানো চারা গাছের যত্ন নিন। পশুর আক্রমন থেকে চারা গাছ রক্ষার ব্যবস্থা করুন।

(৬) আমগাছের পরিচর্যা:- (ক) চাষী ভাই আমগাছে প্রতিবছর পরগাছা জন্মে। পরগাছা পরিস্কার করা না ঘলে অনেক পোকার আবাস স্থল হয়। বিশেষ করে গাছের ফলন কমে যায়। চাষী ভাই এ পক্ষকালে আম গাছের পরগাছা পরিস্কার করুন।

(খ) আমগাছের মাজরা পোকার আক্রমন:

অনেক চাষী ভাই যোগাযোগ করে জানাচ্ছেন যে, তাদের আমগাছের শাখা শুকিয়ে যাচ্ছে এবং ভেঙ্গে যাচ্ছে । ফলে গাছের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে।

চাষী ভাই আমগাছের কান্ডে এবং শাখায় মাজরা পোকার আক্রমন হলে এরূপ হয়ে থাকে। পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী মাজরা পোকা গাছের কান্ডে এবং শাখায় ছোট ছিদ্র করে ডিম দিয়ে আটা দিয়ে ঢেকে দেয়। ডিম থেকে কিড়া বেড় হয়ে কান্ড এবং শাখা ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে পরে এবং গাছের ভিতরে কুড়ে কুড়ে খায়। শাখা শুকিয়ে ভেঙ্গে পরে। চারা গাছে আক্রমন হলে গাছ মারা যেতে পারে। বড় গাছে ব্যাপক আক্রমন হলে ফলন ব্যাপক ভাবে কমে যায়। এমনকি গাছ মারা যেতে পারে।

দমন ব্যবস্থা:-এ পোকার আক্রান্ত স্থানে শুকনো ছোট ছোট শক্ত বলের পোকার মল দেখা যায়। আক্রান্ত স্থানে সাইকেলেরস্পোক ঢুকিয়ে দিয়ে পোকা মেরে ফেলা যায়। এছাড়া আক্রান্ত ছিদ্রে ক্রাসিন দিয়ে পোকা মেরে ফেলা যায়। যদি আক্রমন বেশী হয়ে থাকে সে ক্ষেত্রে আক্রান্ত স্থানের নিচ দিয়ে পোকা সহ শাখা কেটে ফেলে আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। এর পর গাছের চার পাশ কুপিয়ে দানাদার কীট নাশক প্রয়োগ করলে এপোকা দমন হবে।

(৭) শশা চাষ:-*অনেক চাষী ভাই রমজানকে সামনে রেখে বারমাসি শশার চাষ* করেছেন। জাত ভেদে বীজ বোনার ৪৫-৬০ দিনের মধ্যে ফসল তোলা যায়। ভাল ফলনের জন্য এ পক্ষ কালে নিম্নবর্ণিত কাজগুলি করতে পারেন।

৭.১ অন্তরবর্তীকালীন পরিচর্যা:- শশা পানির প্রতি খুবই সংবেদনশীল। প্রয়োজন হলে সেচ দিতে হবে। তবে জমিতে যেন পানি জমে না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। খেত আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

সুতালি/ বাঁশের কঞ্চি দিয়ে বাউনি দিতে হবে। ২ বেডের জন্য একটি বাউনি দিলে চলবে। ৭.২ পোকা দমন:-

৭.২.১ পামকিন বিটল:-

পামকিন বিটল শশার খুবই ক্ষতিকারক পোকা । সব বয়সের গাছে এ পোকা আক্রমন করতে পারে। এ পোকা লাল ও সবুজ রংগের হয়ে থাকে। এ পোকা গাছের পাতা খেয়ে ফেলে।

এ পোকা ফুল ও ফলে ও আক্রমন করে।

এ পোকার কিড়া মাটির নিচের কান্ডে আক্রমন করে ফলে গাছ মারা যায়।

দমন ব্যবস্থা:

চারা গাছ আক্রান্ত হলে পোকা হাতে মেরে ফেলা যায়।

বড় গাছ আক্রান্ত হলে মাদার চার পাশের মাটির সাথে দানাদার কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

৭.২.২ কাঁঠালে পোকা:-

এ পোকা পাতার শিরাগুলোর মাঝের অংশ খেয়ে ফেলে। শিরা বাদে পাতা ঝরঝরা করে ফেলে।

দমন ব্যবস্থা:-

পোকা সহ আক্রান্ত পাতা বাছাই করে মেরে ফেলতে হবে।

আক্রমণ বেশী হলে ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি, প্রতি লিটার পানিতে ২ মি লি পরিমান মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

৭.৩ রোগ বালাই দমন:

৭.৩.১ সাদা গুঁড়া রোগ/পউডারী মিলডিউ পাতায় প্রথমে সাদা দাগ পড়ে । ধীরে ধীরে দাগগুলো বড় ও বাদামী হয়ে শুকিয়ে যায়।

আক্রমণ বেশী হলে গাছ মারা যেতে পারে। ফল ঝরে যেতে পারে।

দমন ব্যবস্থা:-

আক্রান্ত পাতা ও গাছ সংগ্রহ করে পুড়ে ফেলতে হবে।

প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম থিওভিট মিশিয়ে ১৫ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে।

৭.৩.২ মোজাইক ভাইরাস: প্রথমে পাতায় হালকা সবুজ ও হলুদ দাগ পড়ে। দাগগুলি ক্রমশ বড় হয়ে মোজাইক এর মত দেখায়। পাতা কুকঁড়ে যায় ও গাছ খাটো হয়ে যায়।

দমন ব্যবস্থা:-

গাছ আক্রান্ত হওয়া মাত্র তুলে মাটিতে পুতে ফেলতে হবে।

বাহক পোকা দমনের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ম্যালাথিয়ন/সুমিথিয়ন ২ মিলি মিশিয়ে ১০-১৫ অন্তর স্প্রে করতে হবে।

৭.৩.৩ গামোসিস :-

কান্ডে গোড়া থেকে পুঁজ বেড় হয়।

কান্ডে কালো দাগ পড়ে। কান্ড ফেটে যায় এবং পচে গাছ মারা যায়।

দমন ব্যবস্থা:-

প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রা: কুপ্রাভিট মিশিয়ে ১০ দিন অন্তর গাছের গোড়ায় স্প্রে করতে হবে।

মোহাম্মদ আব্দুস সোবহান
সেক্রেটারী জিরায়া'ত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ।
মোবাইল:-০১৯০১৩৫২০৬৭২

দৈনিক পত্র-পত্রিকার পাতা থেকে

সংকলন ও উপস্থাপনা ঃ এম, আহমদ

ইসলাম ও মুসলিমের ১০ জঙ্গী গুলি তৈরীর প্রশিক্ষণ নিয়েছে ॥

নতুন জঙ্গী সংগঠন 'ইসলাম ও মুসলিম' এর জঙ্গীরা গত কয়েক মাসে ১৬টি অস্ত্র সংগ্রহ করেছে ভারত থেকে। সংগঠনের দ্বিতীয় শীর্ষ নেতা সেলিমের তত্ত্বাবধানে এসব অস্ত্র আনা হয়। এসব অস্ত্রের গুলি তৈরীর ওপর সংগঠনের ১০ জন জঙ্গীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। পুলিশের বিশেষ শাখার (এসবি) জঙ্গী দমন সংক্রান্ত বিশেষ গোয়েন্দা দল গত ৩০ জুন নতুন দলটির শীর্ষনেতা আব্দুর রহীম ওরফে শাহাদাত সহ ৪ জনকে গ্রেপ্তার এবং ৫ দিনের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। জিজ্ঞাসাবাদে তারা অস্ত্র ও গুলি সংগ্রহের বিষয়ে পুলিশকে এসব তথ্য দেয়। (প্রথম আলো, ১১/০৭/০৯)

মাদ্রাসায় কোন মানব প্রতিকৃতি আঁকা ও প্রদর্শন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ॥

নেজামে ইসলাম পার্টির সভাপতি মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুর রকিব এডভোকেট যেসব মাদ্রাসায় জাতীয় সঙ্গীত ও ছবি টানানো হয়নি তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সুপারিশে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, এ ধরনের সুপারিশ অনাকাঙ্খিত ও চিরায়ত মূল্যবোধের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং এই সুপারিশ মুসলমানদের লালিত ও ধারণকৃত তৌহীদবাদী আকিদার চিরন্তন চেতনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কেননা কোন মানব প্রতিকৃতি আঁকা, প্রকাশ ও প্রদর্শণ ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম। (ইনকিলাব, ১৫/০৭/০৯)

আগামী একশ' বছরেও যমুনা সেতু ভাঙনের হুমকিতে পড়বে না ॥

সিরাজগঞ্জ শহরের পাশাপাশি যমুনা সেতুও ভাঙনের হুমকিতে রয়েছে বলে সংবাদ মাধ্যমে যে খবর বেরিয়েছে তা সরাসরি নাকচ করে দিয়েছেন যোগাযোগমন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেন। তিনি বলেছেন, আগামী একশ' বছরেও যমুনা সেতু ভাঙনের হুমকিতে পড়বে না। শহররক্ষা বাঁধে সম্প্রতি যে ক্ষতি হয়েছে তার ১০ গুণ শক্তিশালী আঘাত এলেও যমুনা সেতু হুমকিতে পড়বে না। গতকাল রোববার দুপুরে সিরাজগঞ্জের ভাঙনকবলিত এলাকা পরিদর্শনের সময় তিনি এসব কথা বলেন। (সমকাল, ১৩/০৭/০৯)

ছয় হাজার শূন্যপদে চিকিৎসক নিয়োগের নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর॥

দেশে ছয় হাজার শূন্যপদে চিকিৎসক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ জন্য প্রয়োজনে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ দিয়ে পরে সরকারী কর্মকমিশনের (পিএসসি) আনুষ্ঠানিকতা শেষ করা যেতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ৬৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে গতকাল শুক্রবার শহীদ ডা. মিলন মিলানায়তনে আয়োজিত ঢাকা মেডিকেল কলেজ অ্যালামনাই ট্রাষ্টের পুনর্মিলনী-২০০৯ অনুষ্ঠানে ভাষণদানকালে প্রধানমন্ত্রী এ নির্দেশ দেন। (প্রথম আলো, ১১/০৭/০৯)

নবীগঞ্জে মাটির ঘরের দেয়াল ধসে একই পরিবারের ৬ জন নিহত ॥

হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলার পানিউমদা ইউনিয়নের দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় শুক্রবার গভীর রাতে মাটির ঘরের দেয়াল ধসে শিশুসহ একই পরিবারের ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। জানা যায় শুক্রবার গভীর রাতে মুষলধারে বৃষ্টির সময় ঘরের দেয়াল ধসে পড়লে ঘুমিয়ে থাকা ৬ সদস্যের পরিবারের সবার মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। শনিবার সকালে টিলায় ছাগল চড়াতে গিয়ে জনৈক মহিলা মোবারকের পরিবারের করুণ পরিণতি দেখে চিৎকার শুরু করলে এলাকাবাসী স্থানীয় চেয়ারম্যান ও পুলিশে খবর দেয়। (যুগান্তর, ০৫/০৭/০৯)

মিনারেল ওয়াটারের নামে ওয়াসার পানি ॥

মিনারেল ওয়াটারের নামে আমরা কী খাচ্ছি? ওয়াসার পানি কন্টেনারে (জার) ভরেই হয়ে যাচ্ছে মিনারেল ওয়াটার। এসব তৈরীর কারখানায় পরিশোধনের কোন বালাই নেই। নেই কোন পরীক্ষাগার। আছে শুধু জারের মুখে ছিপি লাগানোর উপকরণ। ছোট্ট নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর কক্ষ। কারখানার ভিতরে বিভিন্ন পয়েন্টে বাদুরের মত ঝুলে আছে অসংখ্য মাকড়সার জাল। এখান থেকেই বেরিয়ে আসছে ওয়াসার লাইনের ট্যাপের পানি ভর্তি হাজার হাজার কন্টেনার। রাজধানীতে রয়েছে মিনারেল ওয়াটার প্রস্তুতকারীর নামে প্রতারণার শতাধিক কারখানা। বেশ কয়েকটি চক্র এই প্রচারণামূলক বাণিজ্য অবাধে চালিয়ে যাচ্ছে। সোমবার বিএসটিআই এবং র‌্যাব-১ যৌথভাবে ভেজাল বিরোধী অভিযান চালিয়ে রাজধানীর উত্তরার দালিপাড়া ও তেজগাঁও স্টেশন রোডে এমন দু'টি অবৈধ কারখানার সন্ধান পায়।

(জনকণ্ঠ, ১৪/০৭/০৯)

জঙ্গীদের তালিম ॥

নিজেদের বিচার প্রক্রিয়া নস্যাত করতে যুদ্ধাপরাধীরা জঙ্গীদের তালিম দিচ্ছে। জঙ্গীদের হামলার প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে যুদ্ধাপরাধীরা ইসলামের দোহাই দিয়ে জঙ্গীদের কাজে লাগানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। জঙ্গীদের এই বলে প্রলুব্ধ করা হচ্ছে যে, ভবিষ্যতে জঙ্গীরা তাদের ছায়ায় এদেশে বহাল তরবিয়তে থাকতে পারবে। তাদের সবকিছু মেনে নেয়া হবে। গোয়েন্দা সূত্র জানায়, ইতোমধ্যে যুদ্ধাপরাধীরা রাজধানীর পাশে অন্তত ৫ বার গোপন বৈঠকে মিলিত হয়েছে। বৈঠকে পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আপাতত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের সিদ্ধান্ত হয়েছে। পরিস্থিতি খারাপের দিকে গেলে যে কোন সময় বড় ধরনের হামলা করার সিদ্ধান্ত রয়েছে। গোপনে জঙ্গীরা বিস্ফোরক সংগ্রহ করছে। গোয়েন্দাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে ছোট ছোট নতুন দল গঠন করা হচ্ছে। গোয়েন্দা সূত্র জানায়, জঙ্গীরা গ্রেপ্তার হলেও আশাতিত হারে বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার হচ্ছে না। জঙ্গীদের কাছে বিস্ফোরকের প্রকৃত মজুদ সম্পর্কে কোন প্রকৃত তথ্য নেই গোয়েন্দাদের কাছে।

(জনকণ্ঠ, ১১/০৭/০৯)